# মহামানব বুদ্ধ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

মহামানব বুদ্ধ
রাহুল সাংকৃত্যায়ন

# মহামানব বুদ্ধ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

MAHAMANAB BUDDHA
Bengali translation of Rahula Sankrityayan's Hindi Original
*Mahamanab Buddha*



**প্রথম সংস্করণ**
মার্চ ২০০৪ ॥ চৈত্র ১৪১০
**দ্বিতীয় মুদ্রণ**
ডিসেম্বর ২০০৭ ॥ অগ্রহায়ণ ১৪১৪
**তৃতীয় মুদ্রণ**
নভেম্বর ২০১৩ ॥ কার্তিক ১৪২০

**প্রকাশক**
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

**অক্ষরবিন্যাস**
কম্পোজিট
৩৪/২, বাজেশিবপুর রোড, হাওড়া ৭১১ ১০২

**মুদ্রাকর**
প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

**প্রচ্ছদ**
জয়দীপ সেন

ISBN : 81-85696-55-1

**দাম : ₹ ৬০.০০**
**Price : ₹60.00**

## কিছু কথা

বুদ্ধের জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গগুলির উপর এই ছোটো পুস্তকটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় ২৫তম শতাব্দী উপলক্ষ্যে লেখা হয়েছিল। বুদ্ধের জীবনী এবং তাঁর বিচারধারা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য 'বুদ্ধচর্যা', 'দীঘনিকায়', 'মজ্‌ঝিমনিকায়', 'বিনয়পিটক', বৌদ্ধ দর্শন ইত্যাদি আমার লেখা বা অনুবাদ করা গ্রন্থগুলি দেখা উচিত।

**রাহুল সাংকৃত্যায়ন**

মুসৌরী
১৩-৮-৫৬

## অনুবাদ প্রসঙ্গে

১৯২৭ সালে শ্রীলঙ্কার সমুদ্রতটে যে শালপ্রাংশু, সুদর্শন ব্যক্তিটি পদার্পণ করেছিলেন তাঁকে 'দম্বদিউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতুমা' বা 'জম্বুদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' বলে সাদরে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসেন বিদ্যালঙ্কার বৌদ্ধ মঠের শ্রমণেরা। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তখনও রামোদার সাংকৃত্যায়ন রূপেই বহুল পরিচিত। সেই প্রথম প্রবেশ, পূর্ণ প্রবেশ— বৌদ্ধ জগতে। এরপর পথ চলা—পর্বত কন্দর থেকে প্যারিসের রাজপথ—কখন যে ব্রাহ্মণের বস্ত্র খসে গায়ে উঠে এসেছে বৌদ্ধ ভিক্ষুর চীবর—তা হয়তো রাহুল নিজেই জানতে পারেননি। কলম্বোর এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে গোগ্রাসে, অদম্য জ্ঞানস্পৃহায় পালি ত্রিপিটক ও বৌদ্ধাগম অধ্যয়ন করতে গিয়ে একটি আড়াই হাজার বছর বয়স্ক মানুষকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

হ্যাঁ, এই বইটিও সেই মানুষটিকে কেন্দ্র করে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ব্যক্তিত্ব বিবর্তন ঘটেছে ঠিকই। বৈষ্ণব সাধু থেকে আর্যসমাজী প্রচারক হয়ে যে মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রব্রজ্যা-জীবন মাত্র বারো বছর (১৯২৭-১৯৩৯)। সাম্যবাদের গণআন্দোলনে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন রাহুল। কিন্তু, মনের কোণেই নয়, হৃদয় মাঝারে আড়াই হাজার বছর বয়স্ক মানুষটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এতটুকু ম্লান হয়নি। সেই মানুষটির প্রগতিশীল চিন্তাধারা রাহুলকে উদ্বুদ্ধ করেছে সমাজকে আরও প্রগতিশীল করে তুলতে। আরও দুর্জয়, সংকীর্ণ, সাম্রাজ্যবাদের বাধা ভেঙে মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসতে।

আড়াই হাজার বছর বয়স্ক গৌতম বুদ্ধ আর সত্তর বছর বয়সে চলতে চলতে থেমে যাওয়া রাহুল সাংকৃত্যায়নের (১৮৯৩-১৯৬৩) এটাই প্রধান যোগসূত্র। এই বইটিও সেই যোগসূত্রের কথাই স্মরণ করাবে।

'মহামানব বুদ্ধ' রাহুলের মুসৌরীতে থাকাকালীন প্রথম প্রকাশিত হয়। সেটা ১৯৫৬। এটা ২০০৪-এর প্রথমদিক। 'চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড' তার সংঘর্ষমুখর কিন্তু অটল, অচল, প্রাজ্ঞ অস্তিত্বের দ্বারা একনিষ্ঠভাবে রাহুলের প্রতি আমাদের জাতীয় ঋণ পরিশোধ করে চলেছে।

চিরায়ত প্রকাশনের পরিচালক-মণ্ডলীকে এই ব্যতিক্রমধর্মী কর্মকাণ্ড ও একাগ্রতাকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বুদ্ধের বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দিকগুলি আলোচিত হয়েছে গ্রন্থটিতে— । রাহুল গবেষক রূপে আমার বারেবারেই মনে হয়েছে—ব্যক্তি রাহুলকে না জানলে লেখক রাহুল কিছুটা পর্দার আড়ালে রয়ে যান। 'মহামানব বুদ্ধ' গ্রন্থরূপে এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

অনুবাদ প্রসঙ্গে এখানে ইতি—

**অভিজিৎ ভট্টাচার্য**

**রাহুল সাংকৃত্যায়ন**

( ৯. ৪. ১৮৯৩ — ১৪. ৪. ১৯৬৩ )

## সূচিপত্র

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৫

কিছু কথা ৭

লেখকের প্রতিকৃতি ১১

জীবনী ১৩

জেতবন দান ২৩

জীবনের শেষ বছর ২৮

বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব এবং জীবনদর্শন ৩৮

বুদ্ধ-কালীন নাটক ৫১

অবন্তীতে ধর্ম-প্রচার ৫৩

গৃহস্থের ধর্ম ৫৮

অহিংসা ৬১

ভৈষজ্য-গুরু ৬৭

জন্ম নয় গুণ ৭০

মহান জনবাদী বুদ্ধ ৭৩

দার্শনিক সিদ্ধান্ত ৭৭

বুদ্ধ দর্শন ৮৩

অনিত্যবাদী ৮৫

প্রজ্ঞাপারমিতা ৮৭

বৌদ্ধ ধর্মের অবদান ৯০

বৌদ্ধ দার্শনিকদের অবদান ৯২

# জীবনী

## ১ বাল্যকাল

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম খ্রিঃ পূঃ ৫৬৩-র আশপাশে হয়েছিল। তাঁর পিতা শুদ্ধোদনকে শাক্যদের রাজা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা জানি যে শুদ্ধোদনের সঙ্গে ভদ্দিয় এবং দণ্ডপানিকেও শাক্যদের রাজা বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ এই যে শাক্যদের প্রজাতন্ত্র বা গণসংস্থার (সিনেট বা পার্লামেন্ট) সদস্যদের লিচ্ছবিগণের ন্যায় রাজা সম্বোধন করা হত। সিদ্ধার্থের মা মায়াদেবী নিজের বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন, সেই সময় কপিলবস্তু থেকে কিছু দূরে লুম্বিনী নামক শালবনে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের ৩১৮ বছর পরে এবং নিজের রাজ্যাভিষেকের বিংশতিতম বর্ষে অশোক এই স্থানেই একটি পাষাণ স্তম্ভ প্রোথিত করেন, যা আজও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহ পরেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়, এবং তাঁর লালন-পালনের ভার একাধারে তাঁর মাসি এবং বিমাতা প্রজাপতি গৌতমীর উপর বর্তায়। ক্রমে ক্রমে ষোলোটি বছর কেটে গেল। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের জন্য তিনটি ঋতুর উপযোগী, তিনটি মহল নির্মাণ করলেন। মহা প্রাচুর্যের মধ্যে উপভোগের বহু সামগ্রী নিয়ে— অপরূপ রূপসি নর্তকীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সিদ্ধার্থ চূড়ান্ত পার্থিব সুখ উপভোগ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শুদ্ধোদন প্রতিবেশী কোলিয় গণের (প্রজাতন্ত্র) সুন্দরী কন্যা ভদ্রা কাপিলায়নী (বা যশোধরার) সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দেন।

কপিলবস্তুতে এ নিয়ে গুজব ওঠে যে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভোগবিলাস পরায়ণ হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ। কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা দেখা দিলে সিদ্ধার্থ কীরূপে সমস্যার মোকাবিলা করবেন?

কথাটি শুদ্ধোদনের কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি, একদিন সিদ্ধার্থকে ডেকে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

সিদ্ধার্থ শান্ত, নিস্পৃহ গলায় বললেন—"পিতা, আমার আলাদা করে শিক্ষক রেখে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি মূলগত বিদ্যাগুলি জন্মাবস্থাতেই আপন স্বভাবগুণে আয়ত্ত করেছি। আপনি চারিদিকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিন। আজ থেকে আগামী সপ্তম দিনে আমি রাজ্যবাসীকে আমার যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতা দেখাব।"

রাজা তেমনটাই করলেন। সপ্তম দিনে রাজা, রাজ্যবাসী সমভিব্যাহারে সিদ্ধার্থের যুদ্ধবিদ্যার কৌশল পরিদর্শন করলেন। সিদ্ধার্থ একা নয়, তাঁর প্রতিযোগীরূপে বহু ধুরন্ধর ধনুর্ধরও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে বিস্মিত ও হতবাক করে সিদ্ধার্থ বিভিন্ন যুদ্ধবিদ্যার অস্ত্রশস্ত্র এমন পারদর্শিতা সহকারে চালনা করতে লাগলেন— যে সাধারণ যোদ্ধারা তো দূর, অভিজ্ঞ শস্ত্রচালনায় বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন বীরেরা সিদ্ধার্থের অস্ত্রচালনা দেখে তাঁর অতিমানবিক

প্রতিভা সম্পর্কে ধন্য-ধন্য করতে লাগলেন। যে গুজব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—তা জয় জয়কারে পরিণত হল।

একদিন সিদ্ধার্থ বাগিচা ঘুরে দেখবার ইচ্ছায় সারথিকে রথ আনতে বললেন। রথে চড়ে সিদ্ধার্থ বাগিচার দিকে এগিয়ে চললেন। এই বাগিচা ভ্রমণের সময়েই যে সিদ্ধার্থের জীবনে একটি বিশাল পরিবর্তন সংঘটিত হবে— সে বিষয়ে সিদ্ধার্থ কোনোভাবেই কিছু বুঝতে পারেননি। পথে যেতে যেতে হঠাৎ সিদ্ধার্থ দেখতে পেলেন যে একটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, দন্তহীন মুখে, কুঁজো হয়ে ভেঙে পড়া শরীরে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তার সারাটা শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। সিদ্ধার্থ এর আগে এমন চেহারা দেখেননি। তিনি সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করলেন—"এটি কে? কী কারণে এই ব্যক্তির এমন অবস্থা?" ছন্দক বলল—"হে রাজকুমার, এটা জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী সত্য। একে বার্ধক্য বলে। আজ যে জোয়ান, রূপবান, কাল সে পক্ককেশ, লোলচর্ম, নুয়ে পড়া বৃদ্ধ। কালের প্রবাহে সবারই এমন অবস্থা হবে।"

শুনে সিদ্ধার্থ স্তম্ভিত হলেন। তাঁর দেখা জগৎ এবং পরিবেশ যে আদৌ চিরন্তন নয়, তাঁর শরীরে যে চিরযৌবন থাকবে না—একদিন ধূসর স্বপ্নের মতো এই রঙিন দিনগুলি হারিয়ে যাবে—এই নির্মম সত্যের আঘাত, সিদ্ধার্থের প্রাণের গভীরে গিয়ে বাজল। গভীর চিন্তাক্লিষ্ট মনে তিনি প্রাসাদে ফিরে এলেন।

এরপর অন্য একদিন সেভাবেই বাগিচা পরিভ্রমণে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ একটি রোগে জর্জরিত হয়ে কাতর স্বরে আর্তনাদ করতে থাকা ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। সিদ্ধার্থের কোমল প্রাণে লোকটির এরূপ অবস্থা দেখে বিশেষ আঘাত লাগল। সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করাতে জানতে পারলেন—এর নাম ব্যাধি। রাজা থেকে ভিখারি, ধনী থেকে দরিদ্র সবারই, এই ব্যাধি হতে পারে। সিদ্ধার্থ আবার হতবাক হয়ে গেলেন। জগতের সত্য যে এত রূঢ়, নিষ্ঠুর, তা তাঁর ধারণারই বাইরে ছিল। একে একে বাস্তব জগৎ তার নির্মম সত্যগুলি নিয়ে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। পরবর্তী দিনগুলিতে পরিভ্রমণে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ একটি মৃতদেহ, একজন শান্ত চিত্ত ধীর, স্থির, ধ্যানস্থ সাধুকে দেখলেন। যাবতীয় বস্তুগুলির গভীর ছাপ পড়ে গেল সিদ্ধার্থর মনে। এর মধ্যে রাহুল নামক শিশুপুত্রের জন্ম হয়েছে যশোধরার কোল জুড়ে। সিদ্ধার্থের সামনে এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

## ২ গৃহত্যাগ

কিন্তু যে মহাজীবনের আহ্বান সিদ্ধার্থ প্রাণের গভীরে অনুভব করছিলেন, তা ভোগসর্বস্ব জীবনের পথে নয়, ত্যাগসর্বস্ব জীবনের পথে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি স্বভাবত জানতে চেয়েছিলেন যে জীবনের এই দুঃখময় বাস্তবের বাইরে সত্যিই কি পরিত্রাণের কোনো ব্যবহারিক, যুক্তিগ্রাহ্য উপায় আছে? যদি থাকেও তাহলে কোনোভাবেই এই ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। ভিতরে এক অদম্য তাগিদ, সত্যকে ব্যবহারিক রূপে জীবনে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক জগৎব্যাপী প্রচেষ্টা শুরু করলেন তিনি। এক নবজীবনের দিকে এগিয়ে চললেন সিদ্ধার্থ।

সংসারের এই স্নেহের প্রগাঢ় বন্ধন তাঁর আর সইছিল না। তিনি ভিতরে এক অসম্ভব বৈরাগ্যের আলোড়ন, এক অসীম নিস্পৃহতা এবং সত্যান্বেষণের জন্যে আত্মানুসন্ধানের সাধনার পথ বেছে নেওয়ার জন্যে বিশেষ আকুলতা অনুভব করছিলেন। যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন সিদ্ধার্থের মনে আনন্দের স্থানে বিষাদ জেগে উঠেছিল। তিনি স্বগতোক্তি করেছিলেন যে 'এ পুত্র নয়, এ মূর্তিমান রাহু'। এর থেকেই পরবর্তীতে সিদ্ধার্থের পুত্রের নাম রাহুল রাখা হয়।

মনে মনে তিনি গৃহত্যাগের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। একদিন রাতে সিদ্ধার্থ নৃত্যবাদ্যগীতরতা কন্যাদের সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদে বসে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান দেখছিলেন। ধীরে ধীরে অনেক রাত হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ ক্লান্তদেহে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর পূর্বের ন্যায় আর এধরনের জিনিসে রুচি ছিল না। তাঁকে নিদ্রায় অভিভূত দেখে নর্তকীরা একসময় নাচ-গান বন্ধ করে দিয়ে একে একে নিজেরাই বিভিন্ন জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন গভীর রাত। দপ দপ করে সুগন্ধিত তৈলপূর্ণ প্রদীপটি তখনও জ্বলে চলেছে। সিদ্ধার্থের ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে নিশুতি রাতে নিজের পালঙ্কে উঠে বসলেন তিনি। এক তীব্র উদাসীনতা তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠেছে। ধীরে ধীরে তিনি খাট থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। চোখে পড়ল, একটু দূরেই গভীর নিদ্রায় নর্তকীরা ঘুমিয়ে রয়েছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন নিদ্রায় অভিভূত নর্তকীদের মধ্যে কেউ ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করছে, কারও মুখ থেকে অবিরত লালা পড়ে কাপড়, বালিশ ভিজে গেছে, কারও মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা নির্গত হচ্ছে—অবিন্যস্ত অবস্থায় শুয়ে থাকার জন্য তাদের বেশবাস স্খলিত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকছে, কেউ গোঙাচ্ছে। সিদ্ধার্থের মনে হল, এই নিস্তব্ধ, অন্ধকার, নিশুতি রাতে চারদিকে যেন অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। প্রেতপুরীর ন্যায় এই সুরম্য রাজপ্রাসাদ যেন সিদ্ধার্থকে তাড়া করতে লাগল। পুরো সংসারটিই একটি দুঃখের আগার বলে মনে হতে লাগল। দুঃখ, শোকে পরিপূর্ণ এই সংসারে যেন সিদ্ধার্থ চারদিক থেকে আর্তনাদের প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলেন। তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল—তিনি ভাবলেন—"আর নয়! এর মধ্যেই যা করবার করতে হবে। আজ এই মুহূর্তেই আমায় গৃহত্যাগ করতে হবে।"

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ ধীর কণ্ঠে বললেন—"এখানে কে আছে?"— চৌকাঠের উপর মাথা রেখে সিদ্ধার্থের বিশ্বস্ত সারথি ছন্দক শুয়েছিল। গলা শুনে সচকিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। বলল—"হে আর্যপুত্র! আমি ছন্দক।"

সিদ্ধার্থ ধীর গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—"ছন্দক, আজ রাতেই আমি মহাভিনিষ্ক্রমণ করতে চাই। আমার জন্যে একটি ঘোড়া নিয়ে এসো।"

ছন্দক অশ্বশালায় ঢুকে ঘোড়ার জিন ইত্যাদি নিয়ে আর্যপুত্র সিদ্ধার্থের জন্যে কোনো অশ্বটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, ভাবতে ভাবতেই দেখতে পেল যে সমস্ত অশ্বের মধ্যে একটি অপরূপ দর্শন ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘোড়াটি শ্বেতবর্ণের, অসাধারণ তেজিয়ান এবং উচ্চ জাতির। এর নাম কন্থক। আশ্চর্যের বিষয়—সে রাতে সেই ঘোড়াটিও যেন জেগেছিল কোনো এক বিশেষ দায়িত্ব পালনের অপেক্ষায়।

এদিকে সিদ্ধার্থের ইচ্ছে হল—গৃহত্যাগ করবার পূর্বে নিজের শিশুপুত্রকে একবার দেখে

যাওয়ার। এই কথা ভেবে সিদ্ধার্থ অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে চললেন। ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দরজা খুলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। তখন রাহুলের বয়স মোটে এক সপ্তাহ। ছোটো একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখতে পেলেন—যশোধরা পরম নিশ্চিন্তে রাহুলের মাথায় হাত রেখে ঘুমিয়ে রয়েছেন। সিদ্ধার্থের একবার ইচ্ছে হল সন্তানকে বুকে নিতে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সতর্ক হলেন—কারণ এরূপ করতে গিয়ে যদি যশোধরার ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে যাত্রায় বিশেষ বিঘ্ন ঘটবে। তাই মনের আকুল ইচ্ছাকে মনেই চেপে রেখে ভাবলেন—"আজ থাক। ভবিষ্যতে যদি কখনও এখানে ফিরে আসি তাহলে পুত্রকে দেখার ইচ্ছে রইল।"

এরপর এল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিশ্বের কল্যাণ এবং যথার্থ সত্যান্বেষণের জন্য কন্থকের পিঠে চেপে ছন্দককে নিয়ে সিদ্ধার্থ সেই রাতে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। এই মহাভিনিষ্ক্রমণের সাক্ষী কেবল সেই সারথি আর অশ্বটিই ছিল—আর কেউ নয়। বলা হয় কন্থক এত বেগে ছুটেছিল—যে একরাতে তিরিশ যোজন দূরে শাক্য, কোলিয় এবং রামগ্রাম নামক তিন-তিনটি রাজ্যের সীমানা পার করে অনোমা নদীর তীরে এসে তাঁরা পৌঁছন।

সিদ্ধার্থ ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালেন। সমস্ত রাস্তায় ছন্দক তার প্রভুকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মনে হয়েছে—আর বোধহয় তার যুবরাজকে সে রথে করে ভ্রমণ করাতে পারবে না, দেখতে পাবে না আর। উদ্‌গত কান্না চেপে রেখে, কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করলেন—"ছন্দক এটি কোন্ নদী?"

কাঁপা গলায় ছন্দক বলল—"হে দেব! এটি অনোমা নদী।"

উদাত্ত, নিস্পৃহ এক অপার্থিব গলায় সিদ্ধার্থ বলে উঠলেন—

"তাহলে অনোমার তীরেই আমার প্রব্রজ্যা হবে।"

ধীরে ধীরে তাঁরা অনোমা নদী পার হলেন। ওপারে এসে সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে তাঁর বহুমূল্য বস্ত্র ও আভূষণ ছন্দকের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—"হে ছন্দক! তুমি এগুলি এবং কন্থককেও নিয়ে যাও। এবার আমি প্রব্রজিত হলাম।"

ছন্দকের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হল। দুচোখে অশ্রু নিয়ে সে বলে উঠল—"হে প্রভু! আপনি কপিলবস্তু অন্ধকার করে চলে যাচ্ছেন! আপনাকে ছাড়া আমরা বাঁচব কি করে? না-না, যদি তাই হয়, তাহলে আমাকেও আপনার সঙ্গে প্রব্রজিত করে নিন। নিয়ে চলুন আমায় আপনার সঙ্গে।"

স্মিত হেসে সিদ্ধার্থ বললেন—"না ভাই, তা সম্ভব নয়। এ পথ বড়ো কঠিন, বড়ো বন্ধুর। আমার জীবন দিয়ে আগে আমি সত্যান্বেষণের একটি কল্যাণময় পথ তৈরি করে দিতে চাই—তারপর সবাইকে সেই শান্তির নীড়ে আসতে আহ্বান করব। কিন্তু আজ নয়। তুমি ফিরে যাও।"

নিজের অপূর্ব ঘনকৃষ্ণ কেশদাম সিদ্ধার্থ তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললেন। বহুমূল্য বস্ত্র পরিত্যাগ করে কেবল একবস্ত্রে তিনি জীবনরহস্যের উত্তর খুঁজতে এগিয়ে চললেন। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়, সিদ্ধার্থের ব্যক্তিত্ব বোধিসত্ত্বে বিবর্তিত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপের সূচনা হল।

বেদনাহত, ব্যথিত ছন্দক, সিদ্ধার্থের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে কপিলবস্তু ফিরে গেল।

স্বয়ং বুদ্ধ চুনারে (সুস্সুমারগিরি) বৎসরাজ উদয়নের পুত্র বোধরাজকুমারকে বলেছিলেন (মজ্ঝিম ২/৪/৫)—

"রাজকুমার, বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে—আমারও মনে হত—'সুখে সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখে সুখ পাওয়া যায়। তাই ..... তরুণ বয়সে আমি, ঘন কালো কেশযুক্ত অবস্থাতেই, সুন্দর যৌবনাবস্থাতেই, প্রথম বয়সে মাতা-পিতাকে অশ্রুসিক্ত অবস্থাতেই ত্যাগ করে ..... গৃহ থেকে প্রব্রজিত হলাম। ..... (প্রথমে) আলার কালামের (কাছে) গেলাম'।"

আলার কালাম কয়েকটি যোগের পদ্ধতি শিক্ষা দেন, কিন্তু সিদ্ধার্থের জিজ্ঞাসা তাতে তৃপ্ত হল না। সেখান থেকে তিনি উদ্দক রামপুত্তের (উদ্রক রামপুত্র) কাছে যান। তিনিও যোগের কিছু প্রথা শেখালেন, কিন্তু তাতেও তাঁর মনে কোনোপ্রকার সন্তোষ উৎপন্ন হল না। তারপর তিনি বোধগয়ার কাছে প্রায় ছয় বছর ধরে যোগ এবং অনশন-ক্রিয়ার কঠোর তপস্যা করেন। এই তপস্যার শারীরিক কৃচ্ছ্রতা সম্বন্ধে তিনি বলেন—

'আমার শরীর (দুর্বলতার) চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। যেন 'আসীতিকের' (অশীতিবর্ষ/আশি বছর বয়স্ক) ন্যায় আমার শরীরের গিঁটগুলি ঝুলে পড়েছিল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি লোলচর্ম ধারণ করেছিল। উটের পায়ের ন্যায় আমার পা ফেটে কর্কশ হয়ে গিয়েছিল। যেমন শালগাছের শাখা প্রাচীন হয়ে গেলে এঁকেবেঁকে যায়, আমার শিরা উপশিরাগুলি সেইরূপ তির্যক হয়ে গিয়েছিল। ..... গভীর কুয়োর মধ্যে যেমন সুদূর আকাশের তারা দেখা যায়— সেইরকম আমার চোখগুলি কোটরাগত হয়ে গিয়েছিল। তিক্ত লাউকে যদি কাঁচা ভেঙে ফেলা হয় রোদে-হাওয়ায় সেটি চুপসে যায়, শুকিয়ে যায়। আমার মাথার চামড়া ঠিক সেইরকম চুপসে, শুকিয়ে গিয়েছিল। ..... সেই অনশন করার পর আমার পিঠের শিরদাঁড়া আর পায়ের চামড়া একেবারে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিল। মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য সামান্য উঠে দাঁড়ালেই আমি মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম। যদি সামান্য গায়ের উপর হাত বোলাতাম, বা একটু জোরে শরীরের উপর ডলতাম, চোখের সামনে গায়ের মরে যাওয়া লোমগুলি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ত। ..... লোকেরা বলাবলি করত—'শ্রমণ গৌতম কেমন কালো হয়ে গেছে—দ্যাখ দ্যাখ।' কেউ বলত—'আরে, কালো নয়রে, শ্যামবর্ণ।' ..... কেউ বলত—'না না! ভঙ্গুরবর্ণ।' জানো, আমার সেই সুন্দর দুধে-আলতা গায়ের রং (পরিঅবদাত), ফর্শা রঙ, একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

"..... কিন্তু এই তপস্যা করেও আমি সেই চরম ও পরম সত্যের দর্শন পেলাম না। তখন মনে ভাবলাম—জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্যে কী অন্য কোনো পথ আছে? সেই বোধি (জ্ঞান) প্রাপ্তির পথ বা উপায় কী হতে পারে? তখন আমার মনে হল—আমি পিতা শুদ্ধোদনের সুবিস্তীর্ণ জমিতে জামগাছের ঠান্ডা ছায়ার তলায় বসে প্রথম ধ্যান করে সেই অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে তারপর বিহার (পরিব্রাজন) করেছিলাম। হয়তো সেই পথটাই সঠিক হবে— সেই ধ্যানই আমায় বোধির পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু এই হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার শরীর নিয়ে ধ্যানে অনুভূতি পাওয়া তো দূরের কথা ঠিকমতো বসতেই পারব না। তাই আগে শরীর ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের দিকে মনযোগ দিলাম। শক্ত খাবার ..... ডাল ভাত ..... গ্রহণ করতে লাগলাম। সে সময় আমার কাছে পাঁচজন ভিক্ষু থাকতেন। ..... আমাকে শক্ত খাবার গ্রহণ করতে দেখে

তাঁরা ভাবলেন যে আমার তপস্যায় স্খলন হয়েছে। ঘৃণার সঙ্গে উদাসীন হয়ে সেই পাঁচজন ভিক্ষু আমায় ছেড়ে চলে যান।''

পরবর্তী জীবন-যাত্রার ব্যাপারে বুদ্ধ অন্য জায়গায় বলছেন—''আমি এক রমণীয় স্থানে, বনজঙ্গলে ঢাকা অঞ্চলে একটি নদীকে (নিরঞ্জনা) বইতে দেখলাম। নদীর ঘাটটি অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিষ্কার। দেখে মনে হল এটাই ধ্যানযোগ্য স্থান। আমি সেখানে বসে পড়লাম। (এরপর) সাধনার দ্বারা জন্ম-মৃত্যুর দুষ্পরিণামকে জেনে ..... আমি পরম অনুপম নির্বাণকে প্রাপ্ত করলাম। আমার পরম জ্ঞানরূপী সত্যের সাক্ষাৎকার হল—আমি চিত্তের চিরন্তন মুক্ত অবস্থা লাভ করলাম। এটাই আমার শেষ জন্ম, এরপর আর (দ্বিতীয়) জন্ম (হবে না)।''

সিদ্ধার্থের এই যে জ্ঞানগত দর্শন তা চারটি ভাগে বিভক্ত। দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু রয়েছে (সমুদয়), দুঃখের নিরোধ বা দুঃখের বিনাশ করা যায় এবং দুঃখ নিরোধের পথ রয়েছে। যে বস্তু বা ঘটনাগুলি বর্তমান, সেগুলি কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সেই হেতুগুলির ব্যাপারে বুদ্ধ বক্তব্য রেখেছেন। এমনকী কারণগুলি নিরোধের উপায়ও তিনি বলেছেন। এমন মত যিনি পোষণ করেন তিনি মহাশ্রমণ।

সিদ্ধার্থ উনতিরিশ বছর বয়সে (৫৩৪ খ্রিঃ পূঃ) ঘর ছাড়েন। ছয় বছর ধরে যোগ তপস্যা করার পর ধ্যান এবং গভীর আত্মচিন্তার দ্বারা ৩৬ বছর বয়সে (৫২৮ খ্রিঃ পূঃ) তিনি বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। তারপর টানা ৪৫ বছর তিনি ধর্ম ও দর্শনের উপদেশ প্রদান করে আশি (৮০) বছর বয়সে ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কুশীনারায় নির্বাণ প্রাপ্তি হন (দেহত্যাগ করেন)।

## ৩ সাধারণ চিন্তাধারা

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবার পর, তিনি সর্বপ্রথম নিজের জ্ঞানের অধিকারী সেই পাঁচজন ভিক্ষুর কথা স্মরণ করলেন, যাঁরা বুদ্ধ অনশন ত্যাগ করায় তাঁকে পতিত, স্খলিত ভেবে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি সেই পাঁচজন সাধুর আশ্রমে পৌঁছলেন। সেটিকে ঋষিপত্তন মৃগদাব নামে অভিহিত করা হত এবং সেটি বর্তমানে বেনারসের সন্নিকটে সারনাথে অবস্থিত। বুদ্ধের প্রথম উপদেশ সেই বিশিষ্ট আশঙ্কাটিকে নির্মূল করার জন্যে উক্ত হয়েছিল—যে আশঙ্কাটিকে পোষণ করে অনশন ত্যাগ করার জন্যে ভিক্ষুরা বুদ্ধকে উপেক্ষা করে ত্যাগ করেছিলেন। বুদ্ধ বললেন (সংযুক্ত ৫৫/২/১)—

''ভিক্ষুগণ, এই দুটি অতিচারের থেকে দূরে থাকা উচিত। (১) কাম সুখে লিপ্ত হওয়া এবং (২) শরীরকে পীড়িত করা। এই দুটি অতিবাদকে ত্যাগ করে আমি মধ্যম পথ খুঁজে পেয়েছি। এই পথ শান্তির পথ, জ্ঞানের পথ, এই পথ চোখ খুলে দেবে। এই মধ্যম-মার্গই আর্য মার্গ। এটিকেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে অভিহিত করা হয়। সঠিক দৃষ্টি (দর্শন), সঠিক সংকল্প, সঠিক বচন, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবিকা, সঠিক চেষ্টা, সঠিক স্মৃতি এবং সঠিক সমাধি হল এই আট প্রকারের মার্গ বা পথ।''

(১) চারটি আর্য সত্য—

দুঃখ, দুঃখ সমুদয় (কারণ), দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধগামী মার্গ—যার উল্লেখ আমরা

এর আগেই করেছি, এদের বুদ্ধ আর্য সত্য বা উচ্চতম সত্য বলেছেন।

(ক) দুঃখ সত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধ বলছেন—"জন্মও দুঃখময়, বার্ধক্যও দুঃখময়, মৃত্যু ..... শোক-ক্রন্দন—মনের খিন্নতা, বিমর্ষতা, বিভ্রান্তি—সবই দুঃখ। যে অপ্রিয় তাঁর সঙ্গে সংযোগ, যে প্রিয়—তাঁর সঙ্গে বিয়োগ — দুঃখজনক। সংক্ষেপে পাঁচটি উপাদানই দুঃখের।"

পাঁচটি উপাদান-স্কন্ধ হল—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এই পাঁচটি উপাদান- স্কন্ধ।

(অ) রূপ—চারটি মহাভূত—পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি—এগুলি রূপ-উপাদান-স্কন্ধ।

(আ) বেদনা—আমরা বস্তু বা তাদের বিচারগত সংস্পর্শে এলে যে সুখ, দুঃখ বা নিরপেক্ষতা (সুখ-দুঃখ হীনতা) অনুভব করি—একেই বেদনা-স্কন্ধ বলা হয়।

(ই) সংজ্ঞা— বেদনার পর মস্তিষ্কে আগে থেকেই ছাপ পড়ে যাওয়া সংস্কারের ফলে যেভাবে আমরা বুঝতে পারি—'এই সেই দেবদত্ত', তাকেই সংজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়।

(ঈ) সংস্কার—রূপগত বেদনা এবং সংজ্ঞার যে সংস্কার মস্তিষ্কের উপর পড়েছে এবং যার সাহায্যে আমরা চিনে উঠতে পারি—'এই সেই দেবদত্ত'—তাকে সংস্কার বলা হয়ে থাকে।

(উ) বিজ্ঞান—চেতনা বা মনকে বিজ্ঞান বলা হয়।

এই পাঁচটি স্কন্ধ যখন ব্যক্তির তৃষ্ণার বিষয় রূপে ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে তখন এদের উপাদান-স্কন্ধ বলা হয়ে থাকে।

(খ) দুঃখের হেতু—দুঃখের হেতু বা কারণ কী? তৃষ্ণাই এর কারণ— তৃষ্ণা অর্থাৎ ইচ্ছা। কামভোগের তৃষ্ণা, ভবজগতের তৃষ্ণা, বৈভবের তৃষ্ণা। কামনার বশবর্তী হয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈশ্যের সঙ্গে বৈশ্য, মাতা পুত্রের সঙ্গে, পুত্রের সঙ্গে মাতা, পিতার সঙ্গে পুত্র, পুত্রের সঙ্গে পিতা, ভাইয়ে-ভাইয়ে, বোনে-বোনে, বোনের সঙ্গে ভাই, ভাইয়ের সঙ্গে বোন, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু লড়াই করে থাকে। এরা নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ-বিসম্বাদ করে একে অন্যের উপর হাতের দ্বারা, লাঠির দ্বারা এমনকী অস্ত্রের দ্বারাও আক্রমণ করে থাকে। ফলস্বরূপ হয়তো তারা মারাও পড়ে বা মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুঃখে ভেঙে পড়ে।

(গ) দুঃখ বিনাশ—এই তৃষ্ণারই নিরোধ, পরিত্যাগ এবং বিনাশকে দুঃখ নিরোধ বলা হয়। যা নিজের কাছে প্রিয় বলে বোধ হয় এবং সেই বিষয়গুলির উপর সংকল্প-বিকল্প, ভাবনা চিন্তা থেকে যখন সে মুক্ত হয়—আর ইচ্ছা থাকে না, তখনই তৃষ্ণার নিরোধ হয়। তৃষ্ণার নাশ হলে পর উপাদানের (বিষয় সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি) নিরোধ হয়। উপাদানের নিরোধ হলে ভব (লোক) যন্ত্রণার নিরোধ হয়। এর ফলে পুনর্জন্মেরও নিরোধ হয়ে থাকে। জন্মের নিরোধ হলে বার্ধক্য, মৃত্যু, শোক, ক্রন্দন, দুঃখ, বিমর্ষতা, বিভ্রান্তি সবই নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে দুঃখেরও নিরোধ হয়।

এই দুঃখনিরোধই বুদ্ধের যাবতীয় দর্শনের কেন্দ্র-বিন্দু।

(ঘ) দুঃখ বিনাশের পথ—দুঃখ-নিরোধের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ কোন্‌টি?

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি পথের আদর্শকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল—জ্ঞান (প্রজ্ঞা), সদাচার

(শীল) এবং যোগ (সমাধি)। এদের ভাগ করলে পরে দাঁড়ায়—

| | |
|---|---|
| (ক) জ্ঞান | সঠিক দৃষ্টি |
| | সঠিক সংকল্প |
| | সঠিক বচন |
| (খ) শীল | সঠিক কর্ম |
| | সঠিক জীবিকা |
| | সঠিক চেষ্টা |
| (গ) সমাধি | সঠিক স্মৃতি |
| | সঠিক সমাধি |

(ক) সঠিক জ্ঞান—

সঠিক (সম্যক) দৃষ্টি—কায়িক, বাচিক, মানসিক, খারাপ বা ভালো কাজের সঠিক জ্ঞানকে সঠিক দৃষ্টি বলা হয়। খারাপ বা ভালো কাজগুলি এইপ্রকার—

| | | **খারাপ কাজ** | **ভালো কাজ** |
|---|---|---|---|
| কায়িক | ১. | হিংসাবৃত্তি | অহিংসা |
| | ২. | চৌর্যবৃত্তি (চুরি) | অচৌর্যবৃত্তি |
| | ৩. | যৌন-ব্যভিচার | অ-ব্যভিচারিতা |
| বাচিক | ৪. | মিথ্যাভাষণ | অ-মিথ্যাভাষণ |
| | ৫. | পরনিন্দা-পরচর্চা | পরনিন্দা-পরচর্চা বর্জন |
| | ৬. | কটুভাষণ | মিষ্টভাষণ |
| | ৭. | অনর্থক বাজে কথা বলা | প্রয়োজন অনুসারে কথা বলা |
| মানসিক | ৮. | লোভ | অ-লোভ |
| | ৯. | প্রতিহিংসা | অ-প্রতিহিংসা |
| | ১০. | মিথ্যা ধারণা | মিথ্যা-নয় (এমন) ধারণা |

দুঃখ, হেতু, নিরোধ এবং পথের সঠিক জ্ঞানই সঠিক দৃষ্টি (দর্শন) প্রদান করে। সঠিক সংকল্প—রাগ-হিংসা-প্রতিহিংসা রহিত সংকল্পকেই সঠিক সংকল্প বলা হয়।

(খ) সঠিক আচার—

সঠিক বচন—মিথ্যাকথা, পরনিন্দা, কটুভাষণ এবং অনর্থক বাজে কথা বাদ দিয়ে সত্য এবং মিষ্টবচন প্রয়োগ করা।

সঠিক কর্ম—হিংসা-চুরি-ব্যভিচার-মুক্ত (রহিত) কর্মই সঠিক কর্ম।

সঠিক জীবিকা—মিথ্যা-জীবিকা ছেড়ে সত্য আচরণের ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করা। সেই সময়ের শাসক-শোষক সমাজ দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত জীবিকাগুলির মধ্যে প্রাণী হিংসা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত জীবিকাগুলিকেই বুদ্ধ মিথ্যা জীবিকা বলেছেন—

"অস্ত্রশস্ত্রের কারবার, প্রাণীর বা প্রাণীজ দ্রব্যের কারবার, মাংসের কারবার, মদের কারবার, বিষের কারবার।"

(গ) সঠিক সমাধি—

সঠিক চেষ্টা (ব্যায়াম)—ইন্দ্রিয় সংযম, কু-মনোভাবগুলিকে থামানো এবং ভালো উচ্চ চিন্তা-ভাবনার আন্তরিক প্রচেষ্টা। যে ভালো মনোভাবগুলি জেগে ওঠে, সেগুলি সংরক্ষণ করা। এগুলিই সঠিক চেষ্টা।

সঠিক স্মৃতি— কায়া, বেদনা, চিত্ত এবং মনের ধর্মগুলির স্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা। তাদের ক্ষণ-বিধ্বংসী, মলিন হওয়া সর্বদা স্মরণ রাখা।

সঠিক সমাধি—''চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধি বলা হয়''। সঠিক সমাধি সেটাই, যার দ্বারা মনের বিক্ষেপগুলিকে দূর করা যায়। বুদ্ধের শিক্ষাগুলিকে অতি সংক্ষেপে একটি প্রাচীন গাথায় এইভাবে বলা হয়েছে—

''যাবতীয় কুকর্মগুলি পরিহার করা, যাবতীয় শুভকর্মগুলি সম্পাদন করা ও চিত্তের সংযম, এটাই বুদ্ধের শিক্ষা।''

নিজের জীবনে শিক্ষার কী মুখ্য প্রয়োজন— সে ব্যাপারে বুদ্ধ বলছেন—

''হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রহ্মচর্য (ভিক্ষু-জীবন) লাভ, সৎকার প্রশংসা পাবার জন্যে নয়, কোনো শীল বা সদাচার প্রাপ্তির জন্যে নয়, সমাধি প্রাপ্তির জন্যে নয়, জ্ঞান দর্শনের জন্যেও নয়। যে অটুট চিত্তের মুক্তি ও প্রশান্তি বর্তমান—তার জন্যেই এই ব্রহ্মচর্য এটাই সার সত্য— এটাই শেষ কথা।''

বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তাভাবনাকে আরও বিশদভাবে জানার আগে তাঁর জীবনের বাকী অংশটুকু সমাপ্ত করে নেওয়া প্রয়োজন।

সারনাথে প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করার পর, সেখানেই বর্ষাকালটা কাটিয়ে প্রথম চাতুর্মাস্যে নিজের হাতে দীক্ষিত ষাট জন শিষ্যকে স্থানত্যাগ করার সময় বুদ্ধ সম্বোধন করে বলেন—

''ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতার্থে, বহুজনের সুখার্থে, লোকের জীবনে দয়ার প্রলেপ প্রদানের জন্য, দেব-মানবের প্রয়োজন-হিত এবং সুখের জন্য বিচরণ করবে তোমরা। এক সঙ্গে দুজন ঘুরবে না। আমিও উরুবেলায় ..... সেনানী গ্রামে ধর্মোপদেশের জন্যে যাচ্ছি।''

এরপর দীর্ঘ চুয়াল্লিশটি (৪৪) বছর বুদ্ধ বেঁচেছিলেন। এই চুয়াল্লিশ বছরে বর্ষার তিনটি মাস ছাড়া, তিনি সর্বদাই পরিব্রাজন করতেন। যেখানেই যেতেন, জনগণকে ধর্ম ও দর্শনের উপদেশ প্রদান করতেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বুদ্ধ জীবনের ৪৪টি বর্ষাকাল কোথায় কোথায় কাটিয়েছেন তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

| | **স্থান** | **খ্রিস্টপূর্ব** |
|---|---|---|
| | লুম্বিনীতে জন্ম | ৬৫৩ |
| | বোধগয়ায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি | ৫২৮ |
| ১। | ঋষিপতন (সারনাথ) | ৫২৮ |
| ২-৪। | রাজগৃহ | ৫২৭-৫২৫ |
| ৫। | বৈশালী | ৫২৪ |
| ৬। | মঙ্কুল পর্বত (বিহার) | ৫২৩ |

| | | |
|---|---|---|
| ৭। | ................ (ত্রয়স্ত্রিংশ) | ৫২২ |
| ৮। | সুন্সুমারগিরি (চুনার) | ৫২১ |
| ৯। | কৌশাম্বী (এলাহাবাদ) | ৫২০ |
| ১০। | পারিলেয়ক (মির্জাপুর) | ৫১৯ |
| ১১। | নালা (বিহার) | ৫১৮ |
| ১২। | বৈরঞ্জ (কনৌজ— মথুরার মাঝখানে) | ৫১৭ |
| ১৩। | চালিয়া পর্বত (বিহার) | ৫১৬ |
| ১৪। | শ্রাবস্তী (গোন্ডা) | ৫১৫ |
| ১৫। | কপিলবস্তু | ৫১৪ |
| ১৬। | সালবী (অরবল) | ৫১৩ |
| ১৭। | রাজগৃহ | ৫১২ |
| ১৮। | চালিয় পর্বত | ৫১১ |
| ১৯। | চালিয় পর্বত | ৫১০ |
| ২০। | রাজগৃহ | ৫০৮-৪৮৪ |
| ২১-৪৫। | শ্রাবস্তী | ৪৮৩ |
| ৪৬। | বৈশালী | ৪৮৩ |
| | (কুশীনারায় নির্বাণ | ৪৮৩) |

বুদ্ধের বিচরণক্ষেত্র বেশির ভাগই যুক্ত প্রান্তের সমস্ত অঞ্চল এবং সমস্ত বিহার অবধি সীমিত ছিল। এর বাইরে তিনি কখনও যাননি।

# জেতবন দান

সম্পূর্ণ ভারতের ইতিহাসে যদি বুদ্ধের সঙ্গে কোনো পুরুষের তুলনা করা চলে, তাহলে তিনি একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই হতে পারেন—তবুও বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব অবশ্যই মহত্তর বলেই গণ্য হবে। আবার অন্যভাবে দেখলে বুদ্ধ অত্যন্ত উচ্চ স্থানে অবস্থান করলেও অসংখ্য ভারতীয় জনতার মুক্তি ও স্বাধীনতার সেনানী রূপে গান্ধীজিও অগ্রসর হয়েছেন। এটা খুব একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয় যে বুদ্ধ নিজের যুগে, সমস্ত সামাজিক বর্গের মানুষের কাছে প্রিয় ছিলেন বা সমাদৃত ছিলেন। কেন না এ যুগে গান্ধীজিকেও আমরা সেইরূপেই দেখেছি। বুদ্ধ বর্ণ-ব্যবস্থা এবং যজ্ঞ-বলির বিরোধী ছিলেন, তবুও কূটদন্ত, সোণদন্ডের ন্যায় বহুমানিত, রাজমান্য মহাবিদ্বান ব্রাহ্মণরা তাঁর চরণ স্পর্শ করতেন। বুদ্ধ তাঁর দ্বারা স্থাপিত ভিক্ষুসংঘের সাহায্যে একটি অন্যধরনের সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য হবে যে জনতান্ত্রিক বিধানকেই সর্বতোভাবে মানা এবং আর্থিক সাম্য বজায় রাখা। তবুও মগধ, কোশলের রাজা বৈশালী এবং কুশীনারার গণরাজ্যগুলি বুদ্ধের সেবা-সংকার  করার জন্যে মুখিয়ে থাকত। সবচেয়ে উৎপীড়িত জাতি, যাদের আমরা হরিজন বলে থাকি—তাদের উদ্ধারের জন্য তিনি মুখে নয় কাজেও তা করতেন। তাঁর ভিক্ষুসংঘে চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ সবাই সমান ছিল। দুজনে পারস্পরিক অভিবাদন করার সময়ে শুধু এই ব্যাপারে খেয়াল রাখা হত যে, কোন্‌জন প্রথম (আগে) ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করেছে। সেই যুগে ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি প্রধান সামাজিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যাতায়াতের আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু জল-স্থলের দ্বারা যাতায়াতের যে উপায়গুলি ছিল, সেগুলির পূর্ণ ব্যবহার করা হত। নদীতে বড়ো বড়ো নৌকা চলত। কয়েকটি নদী এমন ছিল যে, সেগুলি কেবলমাত্র বর্ষাকালের দুটি মাস নৌ চলাচলের উপযোগী ছিল। সেই নদীগুলিকেও সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হত। যেমন আজমগঢ়, বালিয়া, গাজীপুর জেলার নদীগুলি। সমুদ্রে ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের কাজে জাহাজ চলত। আমাদের এখানে তৈরি সামগ্রীর প্রতিটি স্থানেই খুব চাহিদা ছিল। সেই সময় সাগরের সার্থবাহদের মধ্যে অনেকেই কোটিপতি ছিল। স্থলপথে বেশিরভাগ গোরুর গাড়িই চলত। শ্রাবস্তী কাশী কোশলের রাজধানী ছিল, রাজগৃহ অঙ্গ এবং মগধের, কৌশাম্বী বৎসের, উজ্জয়িনী অবন্তিকার, তক্ষশিলা গান্ধারের। এই রাজধানীগুলি ছাড়া অঙ্গ দেশে ভদ্দিয়, কাশীতে বারানসী, লাটদেশে ভরুকক্ষ (ভড়ৌচ) এবং লাটেই শূপরিক (সুপারা) ইত্যাদি বাণিজ্য সমৃদ্ধ নগরগুলি ছিল, যেখানে বহু ধনবান শেঠ বাস করতেন। এদের মধ্যে অর্থ ও প্রতিপত্তির দিক থেকে শ্রাবস্তীর প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী সুদত্তের স্থান খুবই উচ্চে ছিল।

সুদত্ত 'যথানাম তথাগুণময়' (যেমন নামে, তেমনি আচরণে) পুরুষ ছিলেন। তাঁর বাণিজ্যের বিস্তার সমগ্র সভ্য ভারতের অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। তিনি খুব মুক্ত হস্ত ছিলেন। অনাথ-আতুরদের জন্যে তাঁর ভাণ্ডার সবসময় খোলা থাকত। তাঁর আসল নাম (সুদত্ত) খুব কম লোকেই জানত। সুদত্ত 'অনাথপিণ্ডক' (অনাথদের পিণ্ড বা খাদ্যের গ্রাস প্রদানকারী)

নামেই বহুলপরিচিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত বুদ্ধের সমবয়সীই ছিলেন। বুদ্ধের সন্ন্যাস-জীবনের প্রাথমিক পর্বেই সুদত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির চার-পাঁচ বছর পূর্বেই অনাথপিণ্ডক এই তেজস্বী দিব্য পুরুষকে দর্শন করে উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন। সেই সময়েই তিনি বুদ্ধের ভক্ত হয়ে যান। 'সংযুক্ত নিকায়'-এর একটি সূক্তে (৯১/১/৮) বলা হয়েছে—

"এমনটা আমি শুনেছি— এক সময় ভগবান (বুদ্ধ) রাজগৃহের সীতবনে বিচরণ করছিলেন। সেই সময় অনাথপিণ্ডক গৃহপতি—যিনি রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীর ভগ্নীপতি ছিলেন— কোনো কাজে রাজগৃহে গেলেন। রাজগৃহক-শ্রেষ্ঠী (ব্যবসায়ী) সংঘ সমেত বুদ্ধকে দ্বিতীয় দিনে নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন। তাই তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে নিজের দাসদাসীদের এবং কর্মচারীদের আজ্ঞা দিচ্ছিলেন—

"তাহলে শোন সময়মতো উঠে খিচুড়ি, অন্ন এবং সুপ তৈরি করবে। অনাথপিণ্ডকের মনে হল—এর আগে আমি বাড়ি এলে এই গৃহপতি, সবকাজ ছেড়ে আমার আপ্যায়নেই ব্যস্ত থাকত। আজ এত শশব্যস্ত হয়ে সে দাসদাসীদের বিভিন্ন প্রকারের কাজের হুকুম দিচ্ছে কেন? আমার দিকে তাকাবার তার একদণ্ড ফুরসত নেই। এর বাড়িতে কী মহাযঞ্জ হবে, না বিবাহ হবে, নাকি লোকজন নিয়ে মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আগামীকাল এর বাড়িতে আসবেন।

"রাজগৃহের সেই শ্রেষ্ঠী, দাস এবং কর্মচারীদের আজ্ঞা দিয়ে যেখানে অনাথপিণ্ডক বসেছিলেন, সেই স্থানে এলেন। এসে অনাথপিণ্ডককে প্রণাম করে তিনি একপাশে বসে পড়লেন। রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীকে অনাথপিণ্ডক জিজ্ঞাসা করলেন— কী ব্যাপার, বাড়িতে এত ব্যস্ততা কীসের? অগে আমি এলে আমার আপ্যায়ন ছাড়া অন্যদিকে তোমার নজরই যেত না— আর এখন দেখছি তুমি এমনই ব্যস্ত যে কোনোভাবেই তোমার আমার দিকে নজর দেওয়ার ফুরসত নেই? তোমার বাড়িতে কী বিবাহের দিন স্থির হয়েছে, নাকি অন্যকোনো কারণ? মগধরাজ কী তোমার বাড়িতে নিমন্ত্রিত?"

শ্রেষ্ঠী বললেন—"হে গৃহপতি, আমার এখানে বিবাহের জন্যে আয়োজন বা মগধরাজের আগমন ইত্যাদি কোনো ব্যাপারই নেই। আগামীকাল আমার এখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। সংঘ-সমেত বুদ্ধকে আমার এখানে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছি। অনাথপিণ্ডক এক অজ্ঞাত শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। ধীর, নম্রভাবে তিনি বললেন—'বুদ্ধ'— এই শব্দটি তো এই জগতে দূর্লভ। আচ্ছা এই সময়ে কি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শনের জন্য যাওয়া যেতে পারে?

শ্রেষ্ঠী মাথা নেড়ে বললেন—"আমি দুঃখিত—এসময়ে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শনে যাওয়া সম্ভব নয়। আগামীকালই তাঁর দর্শন পাবেন।"

অনাথপিণ্ডক মনঃক্ষুণ্ণ হলেও ভিতরে ভিতরে বুদ্ধকে দেখার জন্য তাঁর হৃদয় চঞ্চল, উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি এই দিব্য চেতনাসম্পন্ন মহামানবের প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করছিলেন। 'সকালেই ভগবানের কাছে দর্শন করতে যাব' এই ভেবে, মনে মনে অনাথপিণ্ডক অধীর আগ্রহে বুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাতে শুতে যাবার মুহূর্তেও বুদ্ধকে দেখবার তীব্র উৎকণ্ঠা অনাথপিণ্ডকের হৃদয়কে

আন্দোলিত করছিল। রাতে সকাল হয়ে গেছে ভেবে তিনি তিন-তিনবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। এরপর শেষরাতে উঠে অনাথপিণ্ডক রাজগৃহ নগরের প্রধান দরজার কাছে গেলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল সকাল হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও রাতের আঁধার পূর্ণমাত্রায় ছিল। অশরীরী দেবতারা তাঁর সহায় হয়ে প্রধান দ্বার খুলে দেয়। অনাথপিণ্ডক নগরের বাইরে বেরোতেই প্রকাশ বা আলোক অন্তর্হিত হল— চারদিকে তখনও শেষ রাতের গাঢ় অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। অনাথপিণ্ডক রোমাঞ্চিত, সন্ত্রস্ত এবং ভীত হলেন। কম্পিতবক্ষে তিনি ধীরে ধীরে সীতবনের দিকে এগিয়ে চললেন। সেই সময় শেষ রাতে ভগবান বুদ্ধ বাইরে মুক্ত আঙিনায় পায়চারি করছিলেন। তিনি অনাথপিণ্ডককে দূর থেকে আসতে দেখলেন। দেখে পায়চারি করবার স্থান ছেড়ে বিছিয়ে রাখা আসনের উপর এসে বসলেন। অনাথপিণ্ডক এসে পৌঁছতেই তিনি গম্ভীর গলায়—'এসো সুদত্ত'—বলে আহ্বান জানালেন। সেই দিব্য কণ্ঠস্বর অনাথপিণ্ডকের দেহে, মনে, প্রাণে এক অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুলল। অনাথপিণ্ডক ভগবানের মুখে তাঁর নামের আহ্বান শুনতে পেয়ে পুলকিত হলেন। ভক্তিতে আকুল হয়ে অনাথপিণ্ডক ছুটে গিয়ে ভগবানের পায়ে মাথা ঠেকালেন। তারপর আবেগে আপ্লুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—
"ভন্তে, ভগবানের সুখে নিদ্রা হয়েছে তো?"

শান্ত ধীর, অপার্থিব কণ্ঠস্বরে— পরম দিব্য গাম্ভীর্যে ভগবান বললেন—

"(সেই) নির্বাণপ্রাপ্ত ব্রহ্মণ সর্বদাই সুখে নিদ্রা যায়।

"যে কখনও কাম-বাসনায় লিপ্ত হয়ে জর্জরিত হয় না—সেই সুখে নিদ্রা যায়। সমস্ত আসক্তিকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে, খণ্ডিত করে, হৃদয় থেকে চিরতরে ভয় দূর করে, চিত্তকে পূর্ণ শান্ত করে যে—সেই উপশান্ত নির্বিঘ্নে সুখে নিদ্রা যায়।"

বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে অনাথপিণ্ডক বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণাগত হলেন এবং উপাসকরূপে দীক্ষিত হলেন। পরের দিন শিষ্যমণ্ডলী সমভিব্যাহারে বুদ্ধকে তিনি ভোজন করালেন। ভোজনের পর অনাথপিণ্ডক করজোড়ে বুদ্ধকে নিবেদন করলেন— ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে ভগবান কী শ্রাবস্তী-তে বর্ষাবাস স্বীকার করবেন?

বুদ্ধ বললেন—"শোন গৃহপতি—তথাগত একান্ত আগার (নির্জন নিবাসস্থান) পছন্দ করেন।"

অনাথপিণ্ডক রাজগৃহ থেকে শ্রবস্তী যাওয়ার পথে সবাইকে বলতে বলতে গেলেন।—
"হে আর্যগণ! আবাসের নির্মাণ করো, বিহার স্থাপিত করো। পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে। সেই ভগবানকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি। তিনি এই পথ দিয়েই আসবেন।"

শ্রাবস্তী ফিরে এসে অনাথপিণ্ডক এমন একটা স্থান খুঁজতে লাগলেন, যেটা লোকালয় থেকে খুব কাছেও নয়, আবার খুব দূরেও নয়। যাঁদের দর্শনের আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁরা যাতে সহজেই আসতে-যেতে পারেন। এমন স্থান, যেখানে দিনে খুব বেশি ভিড় না হয়, এবং রাতে বেশি শোরগোল না হয়। অনেক খোঁজার পর মনে হল শ্রাবস্তীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত রাজকুমার জেত-এর উদ্যান (বন)-টিই উপযুক্ত স্থান। অনাথপিণ্ডক রাজকুমারের কাছ থেকে বনটি চাইলেন। রাজকুমার বললেন—যদি মুদ্রা বিছিয়ে উদ্যান ঢেকে দিতে পারো— এমনটি যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে আমি এটি তোমায় দেব। এই ধরনের কথা বলায় জেতের মনের

কথাটি জানা গেল এবং উচ্চমহল থেকে ফয়সালা করা হল, যদি শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডক ওরফে সুদত্ত, কোণায় কোণায় মুদ্রার দ্বারা সম্পূর্ণ জমিটি ঢেকে দেন, তাহলে তিনি উদ্যানটি পেতে পারেন।

শ্রাবস্তী আজও আছে তবে তা জনশূন্য একটি প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক ক্ষেত্র (গোন্ডা জেলার সহেট নামক স্থানটিই সেকালের শ্রাবস্তী) আর জেতবন এর থেকে কিছুদূরে (মহেট নামে বহুল পরিচিত) উজাড় হয়ে পড়ে থাকা একটি ধ্বংসাবশেষ । পালি গ্রন্থগুলিতে মুদ্রাকে 'হিরণ্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। হিরণ্য নাম পাওয়া গেলেও, এখনও তেমন কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। রুপো এবং তামা দিয়ে তৈরি মুদ্রা অবশ্য পাওয়া যেত, সেগুলি দেখতে চৌকোণা। রুপোর পাঞ্চমার্ক করা মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলি ১৬৬ থেকে ১৭৫ গ্রেনের। আমাদের মুদ্রায় ১ টাকা ১৭৮ গ্রেনের (এক তোলা) সমান হয়ে থাকে। পালি গ্রন্থাদিতে লেখা আছে যে অনাথপিণ্ডক ১৮ কোটি কার্যাপণ (মুদ্রা) বিছিয়ে জেতবন কিনেছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের আড়াইশো বছর পরে নির্মিত ভারহুতের স্তূপে পাঞ্চমার্ক করা মুদ্রা বিছিয়ে জেতবন ক্রয় করার ঘটনাটিকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এতে লেখা হয়েছে যে 'কোটি সন্‌ঠকেন কেতে' (কোণা থেকে কোণা পর্যন্ত ঢেকে মুদ্রায় কেনা)। এর থেকে সাড়ে ২২০০ বছর আগের এই ঘটনা আমাদের মনে রয়ে গেছে যে অনাথপিণ্ডক প্রচুর অর্থব্যয় করে জেতবনটি ক্রয় করতে পেরেছিলেন। ১৮ কোটি কার্যাপণ বা মুদ্রা দিয়ে ১৪.৩৫ একর জমি ঢাকা হয়েছিল। এখন জেতবনের মুখ্যভাগ ১৪.৭ একর। ভগবান বুদ্ধ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি বর্ষাবাস (২৫) এখানেই কাটিয়েছেন। ত্রিপিটকে সংগৃহীত বুদ্ধের উপদেশাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপদেশ তিনি জেতবনে বসেই দিয়েছেন। জেতবন বৌদ্ধ জগতের একটি অত্যন্ত পূজনীয় এবং প্রিয় স্থান। ১৯৩১ সালে শ্রীলঙ্কা থেকে বহু বড়ো বড়ো মহাবিদ্বান ভারতের জেতবন দর্শনের জন্য আগমন করেন। এদের মধ্যে পূজ্যপাদ মাননীয় ভিক্ষু মহাস্থবির ধম্মানন্দপাদও ছিলেন। * যেখানে কোনো এককালে হাজার হাজার ভিক্ষু বসবাস করে গভীর জ্ঞানচর্চার ধ্যানে দিন অতিবাহিত করতেন, আজ সে স্থান বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত । পুরাতত্ত্ব বিভাগ খনন কার্য চালিয়ে প্রাচীন আবাসের ভিতগুলি খুঁড়ে বের করেছিল। ভারহুতের শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছিল যে দুটি প্রধান কুটীর—গন্ধকুটীর এবং কোসম্বকুটীর—কোথায় হতে পারে। এই দুটিতেই বুদ্ধ বাস করতেন। স্থানগুলি দেখতে দেখতে মহাস্থবির ধম্মানন্দের মুখ থেকে প্রাচীন পালি গাথার অংশবিশেষ বেরিয়ে এল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন—

ইদং জেতবনং পুঞ্ঞং ইসিসংঘেহি সেবিতং........

(ঋষিগণের দ্বারা সেবিত এই জেতবন)

---

* প্রসঙ্গত, বলা উচিত যে, মহাভিক্ষু 'নায়কপাদ ধম্মানন্দ মহাস্থবির' শ্রীলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার বৌদ্ধ পরিবেনের (মঠের) অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পালি ব্যাকরণ ও ত্রিপিটকের অতুলনীয় পণ্ডিত ছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৯৩০ সালে শ্রীলঙ্কায় এঁর কাছেই বৌদ্ধ ভিক্ষু রূপে দীক্ষা (প্রব্রজ্যা) গ্রহণ করেন। ধম্মানন্দ মহাস্থবির করুণা এবং বাৎসল্যের সাক্ষাৎ মূর্তি ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে রাহুলজি তাঁর স্নেহশীতল ছায়ায় বৌদ্ধ ভিক্ষু রূপে জ্ঞানচর্চায় জীবন অতিবাহিত করুক, কিন্তু বৃহত্তর কর্তব্যের তাগিদে রাহুল সেই অনুরোধ রাখতে পারেননি। কিন্তু এই মহান গুরুর কথা রাহুল সারাজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন—অনুবাদক।

বলতে বলতে আবেগে তাঁর গলা বুজে এল এবং তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মহাস্থবিরের ন্যায় বুদ্ধের পরম ভক্তের কাছে ভগবানের প্রধান স্মৃতিপূত স্থানিটর এমন অবস্থা দেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। এদেশে বুদ্ধের নিবাসস্থানের এমন অবস্থা তা তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। গত সাতশো বছর ধরে বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্ম এদেশ থেকে নির্বাসিত ছিল। আজ বুদ্ধ বড়ো গৌরবের সঙ্গে আপন জন্মভূমিতে ফিরে এসেছেন, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার বুদ্ধের ২৫তম নির্বাণশতাব্দীর জন্য দেড় কোটি টাকা খরচ করছে।

অনাথপিণ্ডক শেষ জীবনে ব্যবসায় লোকসানের জন্য দরিদ্র হয়ে যান। তবুও তিনি জেতবন আসতেন এবং কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসতেন, কিছু না পেলে রাপ্তী নদীর বালু এনে উঠোনে ছড়িয়ে দিতেন। রাজকুমার জেত সামান্য জমি কার্ষাপণ বা মুদ্রা দিয়ে ঢাকতে দেননি। সেখানে তিনি নিজের পয়সায় খুব বড়ো ফাটক বানিয়েছিলেন। জেতবনের জন্য জেত রাজকুমারের নাম আজও অমর হয়ে আছে।

# জীবনের শেষ বছর

ঐতিহাসিকদের মতে, বুদ্ধের নির্বাণের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব৪৮৩ সালে। প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে এতে ষাট বছর আরও যোগ করা হয়েছে। সেই মতানুসারে দেখলে খ্রিস্টপূর্ব৫৪৩ বা৫৪৪ হয়ে ইংরেজি ১৯৫৬ সালের মে মাসে নির্বাণলাভের আড়াই হাজার (২৫০০) বছর পূর্ণ হচ্ছে। নির্বাণের দিন থেকে আশি বছর আগে বুদ্ধের জন্ম লুম্বিনীতে হয়েছিল। পরম্পরা অনুসারে দেখলে, বুদ্ধের জীবনের শেষ বছর খ্রিস্টপূর্ব৫৪৫-এর বৈশাখ থেকে ৫৪৪-এর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত মানা যেতে পারে। ঐতিহাসিকদের মতে সময়কালটি খ্রিস্টপূর্ব৪৮৪-র গরমকাল থেকে ৪৮৩-র গরমকালের মধ্যে হবে। সেই এক বছরের বিবরণ ত্রিপিটকের দীঘনিকায়-তে মহাপরিনির্বাণসূত্রে পাওয়া যায়। পিটকেরই ন্যায়, মহাপরিনির্বাণসূত্রও ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলির অনুবাদ চিনা এবং তিব্বতি ভাষায় পাওয়া যায়। একটি চিনা মহাপরিনির্বাণসূত্রর সংস্কৃত অনুবাদ লেখক উদয়পুরের একটি গবেষণা-পত্রিকায় ছাপিয়েছে।

চিনা অনুবাদেও সূত্রের আরম্ভ রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতের উপর আরম্ভ হয়। একই সূত্রারম্ভ পালি ত্রিপিটকেও পাওয়া যায়। চিনা অনুবাদে অজাতশত্রুর বর্ষকার বুদ্ধের কাছে গিয়ে বৈশালীর বজ্জিদের অপরিমিত শক্তির অন্তর্নিহিত কারণ জানতে চায়। এই একই প্রসঙ্গ পালিতেও আছে। বুদ্ধ রাজতন্ত্রের নয়, গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই আদর্শেই তিনি তাঁর সংঘ গঠন করেছিলেন। সংঘের সমস্ত কাজকর্ম, ভোট (ছন্দ) গ্রহণ এবং অন্যান্য অনুশাসনগত ক্রিয়াকলাপ বৈশালীর গণেদের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক এবং সমসূত্রে গ্রথিত ছিল। তিনি কখনও পছন্দ করতেন না যে বৈশালীর ন্যায় সমৃদ্ধ গণরাজ্য কোনো রাজার পায়ের নীচে লুটাক। ভারতে বৈশালী গণরাজ্য এবং গ্রিসে এথেন্স গণরাজ্য সমসাময়িক ছিল। এথেন্স-এর গণতান্ত্রিক সংহতি রক্ষার লোক ছিল, কিন্তু বৈশালীর গণতান্ত্রিকতা চিরকাল উপেক্ষিত হয়েই এসেছে। তাই এদের গৌরবশালী ইতিহাসের কথা আমরা খুব কম জানতে পারি। কিন্তু বৈশালী এথেন্সের চেয়ে অনেক বেশি বলশালী ছিল। তাদের শক্তি আর বীরত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এটাই যে, সেই সময়ের পরম শক্তিশালী মগধরাজ অজাতশত্রু বহুবার চেষ্টা করেও লিচ্ছবীদের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এদের পরস্পর বৈরীতার কারণ সম্পর্কে পালি অট্‌ঠকথার ভাষ্যকার বলছেন—

"গঙ্গার ঘাটের কাছে অর্ধ যোজন অজাতশত্রুর রাজ্য ছিল এবং অর্ধ যোজন লিচ্ছবীদের রাজ্য ছিল। ..... পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বহুমূল্য সুগন্ধিত দ্রব্য নির্গত হত। অজাতশত্রু আজ যাই, কাল যাই করে বস্তুটি সংগ্রহ করতে দেরি করতেন—আর এদিকে লিচ্ছবীরা এক রায়, একমত হয়ে আগেই গিয়ে সব নিয়ে নিতেন। অজাতশত্রু পরে গিয়ে সেই খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে খালি হাতে ফিরে আসতেন। লিচ্ছবীরা পরের বছরও সেই একইভাবে আগেই সবকিছু নিয়ে নিল। তখন অজাতশত্রু অত্যন্ত কুপিত হয়ে ভাবলেন—'গণরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা খুবই মুশকিল। ওদের একটা আক্রমণও ব্যর্থ হয় না। কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে মন্ত্রণা করে কাজ

করাটা ভালো হবে।' এই ভেবে ..... তিনি বর্ষকার ব্রাহ্মণকে পাঠালেন।" (দীঘনিকায়, অট্‌ঠকথা)

অজাতশত্রু সংকল্প করেছিলেন যে—"আমি বৈভবশালী বজ্জিদের উৎখাত করব, তাদের বিনাশ করব।" কিন্তু সেটা নিতান্তই ফাঁকা আওয়াজ ছিল। অজাতশত্রুর প্রেরিত দূত হিসাবে মহামন্ত্রী বুদ্ধকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধের প্রশ্নটি ভালো লাগেনি। তিনি বর্ষকারকে নয়, নিজের পিছনে দাঁড়ানো আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—

"আনন্দ, তুমি কি শুনেছ, বজ্জিগণ বরাবর বৈঠকে একত্র হয়?"

আনন্দ বললেন—"এমনটাই শুনেছি ভন্তে, বজ্জিগণ বৈঠকে নিয়মিত একত্র হয়ে থাকে।"

বুদ্ধ বললেন—"আনন্দ, যতদিন পর্যন্ত বজ্জিগণ বৈঠকে একত্রিত থাকবে—ততদিন তাদের হানির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হবে।"

বুদ্ধ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন—"আনন্দ, তোমার কি শোনা আছে যে বজ্জিগণ একসঙ্গে বৈঠক করে, একই সঙ্গে ওঠে এবং একই সঙ্গে করণীয় কর্তব্য করে থাকে?"

"শুনেছি ভন্তে"—আনন্দ উত্তর দিলেন।

বুদ্ধ বললেন—"শোন আনন্দ, যতদিন পর্যন্ত বজ্জিগণ একসঙ্গে বৈঠক করবে, একই সঙ্গে উঠবে এবং একই সঙ্গে করণীয় কর্তব্য করবে—ততদিন কেউ তাদের হানি করতে পারবে না। তাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হবে।"

তৃতীয়বার বুদ্ধ আনন্দের কাছে প্রশ্ন করলেন—এবার জানতে চাইলেন যে বজ্জিগণ কি অত্যন্ত সৎ? রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে যা বেআইনি তাকে কখনও তারা রেহাই দেয় কি আর যা উচিত সেটি আপাত-তিক্ত হলেও তারা উচ্ছেদ করে কি? না, যা সঠিক, যা আইনানুগ তারা সর্বতোভাবে সেটি মেনেই চলে কিনা?

আনন্দের সায় পেয়ে বুদ্ধ বললেন, যতদিন এটি বজায় থাকবে, ততদিন কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

চতুর্থবারে বুদ্ধ জানতে চাইলেন বজ্জিগণ তাদের সমাজে বৃদ্ধদের সৎকার-সম্মান করে কিনা এবং তাদের কথা শুনে উপদেশ অনুসারে চলে কিনা? যখন আনন্দ হ্যাঁ বললেন—তখন বুদ্ধ আবার স্পষ্টভাষায় জানালেন যে যতদিন এরূপ চলতে থাকবে, ততদিন তাদের শক্তি অক্ষুণ্ন থাকবে।

পঞ্চমবারে বুদ্ধের প্রশ্ন ছিল—তুমি কি জানো যে বজ্জিগণ কুলস্ত্রীগণকে বা কুলকুমারীগণকে সবসময় সম্মান প্রদান করে— জোর করে অপহরণ করে আটকে রাখে না?

আনন্দ বললেন—"ভন্তে, শুনেছি তারা এমনটাই করে, কোনো কুলস্ত্রীকে কষ্ট দেয় না।" বুদ্ধ নির্দ্বিধায় বললেন যে এরূপ সৎ প্রবৃত্তিযুক্ত হয়ে তারা যতদিন থাকবে ততদিন তাদের কেউ কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারবে না।

যষ্ঠবারে বুদ্ধের জিজ্ঞাস্য ছিল যে বজ্জিগণ কি নগরের ভিতরে বা বাইরে যে দেবস্থান বা চৈত্য রয়েছে সেগুলির যথাযথ সৎকার করে বা পূজা করে থাকে? তারা আগের ধর্মানুসারী বৃত্তিগুলিকে বা সেই বৃত্তির উপাসকদের উপর অত্যাচার করে না তো?

আনন্দ বললেন —"না ভন্তে, তারা এরূপ কিছু করে না।" শুনে বুদ্ধ স্পষ্টভাবেই

বললেন—এই শুভকর্মই তাদের বহুদিন ধরে বাঁচিয়ে রাখবে।

আনন্দের কাছে বুদ্ধের শেষ প্রশ্ন ছিল, বজ্জিগণ কি অর্হৎদের (পূজনীয়দের) ধর্ম রক্ষার জন্য তাঁদের সহায়ক হয়? যাতে আরও ত্যাগী পুরুষেরা রাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁরা অধিক সংখ্যায় রাজ্যে পদার্পণ করেন, তার জন্যে তারা কি সচেষ্ট নয়?

'হে ভন্তে', আনন্দ বললেন—তারা এ সবই করে থাকে। যাতে পূজনীয় অর্হৎগণ নিয়মিত ধর্মাচরণ করতে পারেন, তার জন্যে তারা প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকে।

বুদ্ধের কথিত এই সাতটি রাজ্যশাসনের অপরিহার্য ধর্ম আজও সমান প্রয়োজনীয়। যে কোনো গণতান্ত্রিক রাজ্যেরই এটি পথপ্রদর্শক। মহাভারতেও গণের পারিবারিক ঝগড়াকে সবচেয়ে বড়ো সঙ্কট বলে বলা হয়েছে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন বছর পরে অজাতশত্রু হাতিয়ারের দ্বারা নয়, শুধুমাত্র বিভেদ-বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে বৈশালী গণতন্ত্রের শান্তি নষ্ট করে, তাদের একে অপরের শত্রু করে শেষে পরাজিত করে।

পালি সূত্রে ভগবান বুদ্ধের অম্বলট্‌ঠিকা যাওয়া এবং সেখানে সারিপুত্তের সঙ্গে কথোপকথনের কথা লেখা আছে। রাজগৃহ থেকে পাটনা যাওয়ার পথে আজকের ন্যায় সে যুগেও অম্বলট্‌ঠিকা পড়ত। হয়তো স্থানটি নালন্দা এবং রাজগৃহের মধ্যবর্তী একটি জায়গা যা থাকার উপযুক্ত স্থান ছিল। চিন সূত্রগুলিতে এর কোনো উল্লেখ নেই, যা অধিক যুক্তিযুক্ত। আসলে সারিপুত্তের নির্বাণ (দেহত্যাগ) এর আগেই হয়ে গিয়েছিল—তাই তাঁর পক্ষে অম্বলট্‌ঠিকায় এসে কথা বলা সম্ভব ছিল না। চিনা সূত্রে রাজগৃহ থেকে বুদ্ধের পাটলিপুত্র (পাটনা) পৌঁছবার কথা বলা হয়েছে। পালি সূত্রে অম্বলট্‌ঠিকা থেকে পাটলিগ্রাম যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সেকালে পাটলিগ্রমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দুটি প্রত্যন্ত ভাগে বৈশালী গণরাজ্যের এবং অজাতশত্রুর রাজত্ব ছিল। বৈশালী গণ-অধিনায়কদের জন্যে অজাতশত্রুর স্বেচ্ছাচারিতা অনেকটাই কমে এসেছিল।

তখন পাটলিগ্রামে অজাতশত্রুর দুই মন্ত্রী বর্ষকার এবং সুনীথ গঙ্গার তীরে নগর নির্মাণে ব্যস্ত। তার কারণও বৈশালী গণরাজ্যই। বৈশালী গণরাজ্যের প্রতি অজাতশত্রুর মনে সর্বক্ষণ একটা ভয়, একটা আতঙ্ক ছিল। কোনোভাবেই অজাতশত্রু বৈশালীর লোকদের ক্ষতি করতে পারত না। যদি সে আক্রমণ করত, তাহলে তার ফলস্বরূপ লিচ্ছবিরা গঙ্গা পার হয়ে পাটলিগ্রামে মাসের পর মাস শিবির খাটিয়ে বসে শত্রুর অপেক্ষা করত আর বাধ্য হয়ে অজাতশত্রুকে ইঁদুরের ন্যায় রাজগৃহের পাহাড়ী গুহায় ঢুকে বসে থাকতে হত। তাই বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পাটলিগ্রামে যত্নসহকারে নগরটি নির্মিত করা হচ্ছিল। রাজা, রাজ-অমাত্য, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের থাকার জন্য আলাদা আলাদা স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল।

বুদ্ধ পাটলিগ্রামে পৌঁছবার পর মন্ত্রী বর্ষকার তাঁকে নিজের আবাসে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ আতিথ্য স্বীকার করলেন এবং বর্ষকারের আবাসে তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হল। ফেরার সময় বুদ্ধ যে ঘাটে নেমে গঙ্গা পার হলেন— সেটি গৌতম ঘাট নামে অভিহিত করা হল এবং নগরের যে প্রধান দ্বার দিয়ে বুদ্ধ প্রবেশ করেছিলেন সেটির নাম রাখা হল গৌতম দ্বার। চিনা এবং পালি, দুটি সূত্রেই আমরা পাই যে গঙ্গা পার হয়ে বুদ্ধ

কোটিগ্রামে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নাদি-তে এবং তারপর বৈশালীর উপনগরে অম্বপালির বাগিচায় গিয়ে উঠলেন। নগরের প্রখ্যাত গণিকা, অম্বপালি পরের দিন বুদ্ধকে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালে, বুদ্ধ স্মিতহাস্যে তা স্বীকার করলেন। বৈশালীর লিচ্ছবিগণ বুদ্ধের সেবার সুযোগ পেলেন না। যখন তাঁরা বুদ্ধকে নিমন্ত্রিত করার জন্যে রথে চড়ে আসছিলেন সেই সময় রাস্তার মাঝে অম্বপালির রথ তাঁদের পথ রুখে দাঁড়াল। অম্বপালির রথের চাকা, লিচ্ছবিদের রথের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় কর্কশ আওয়াজে ভরে উঠল পরিবেশ। লিচ্ছবিরা একজন সাধারণ গণিকার এই ধৃষ্টতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অম্বপালির মুখে তখন ফুটে উঠেছে এক অভূতপূর্ব তৃপ্তি ও আনন্দের হাসি। স্পষ্ট গলায় সে বলে উঠল—"হে আর্যপুত্রগণ! ভগবান বুদ্ধকে সমস্ত ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে আমি আগামীকাল ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছি।"—এবং সত্যিই, বুদ্ধ অম্বপালির আমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন। লিচ্ছবিদের কিছু বলার ছিল না।

ভগবান বুদ্ধ দূর থেকে লিচ্ছবিদের দেখে এক অদ্ভুত আবেগের সুরে বলে উঠলেন—"ভিক্ষুগণ! সমবেত লিচ্ছবিদের দিকে তাকিয়ে দেখ। দেখ তাকিয়ে ওদের দিকে। ভিক্ষুগণ! লিচ্ছবিদের মণ্ডলীকে সাক্ষাৎ দেবতাদের মণ্ডলী বলে মনে করবে।"—বুদ্ধের আবেগমথিত কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট প্রতিফলিত হচ্ছিল যে তিনি লিচ্ছবিদের কতটা স্নেহ করেন। কিন্তু লিচ্ছবিদের নিমন্ত্রণকে তিনি স্বীকার করতে পারলেন না।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি আর কিছুদিন পরেই। চাতুর্মাস্যের সময় সাধুরা কোথাও যাত্রা করতেন না। সমস্ত বর্ষাকালটি ভিক্ষুদের একটি নির্দিষ্ট স্থানেই থাকতে হত। ভগবান বুদ্ধ বর্ষাবাস কাটানোর জন্য বেণুগ্রাম নামক একটি ছোটো সাধারণ গ্রামে গেলেন। তিনি শিষ্যদের বললেন, বৈশালীর চারদিকে অনুকূল স্থান দেখে চাতুর্মাস্য যাপন করতে।

ঠিক এই সময়েই ঘনিয়ে এল অন্ধকার। বুদ্ধ নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সবাই অসুস্থতার জটিলতা দেখে ভয় পেলেন। একসময় অসুস্থতা রুক্ষ দমকা হাওয়ার মতো যেমন এসেছিল— তেমনই চলেও গেল। কিন্তু যাওয়ার সময় মহীরুহের জীবনের ভিতকে সে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধের তপঃপূত শরীরকে আরও শিথিল-জর্জর করে দিল এই প্রাণান্তকারী অসুস্থতা।

সেরে ওঠার পর, একদিন বিহার থেকে বাইরে বেরিয়ে তারই ছায়ায় বুদ্ধ আসনবদ্ধ হয়ে বসে ছিলেন। শিষ্য এবং প্রিয়ভক্ত আনন্দ একটু দূরেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুদ্ধ লক্ষ করলেন যে আনন্দের মুখখানা ভীষণ বিমর্ষ—কালো মেঘের ন্যায় রাজ্যের আঁধার জমেছে মুখে। দেখে বুদ্ধ সস্নেহে আনন্দকে কাছে ডাকলেন। আনন্দ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ধীর, শান্ত, স্নিগ্ধ স্বরে ভগবান বলে উঠলেন—"বলো আনন্দ, ভিক্ষুসংঘ কী চায়? দেখ, আমি বাইরে ভিতরে একপ্রকার—তাই আমি 'মুক্ত'ভাবে ধর্মোপদেশ দিয়েছি। মন আর মুখ আমার চিরকাল সমান ছিল। আনন্দ, মনে রেখ ধর্মজগতে তথাগতের কোনো আচার্য-পদে নিরবচ্ছিন্নভাবে বসে থাকার স্পৃহা নেই, সে সবসময় মুক্ত। যার মনে হয় যে আমি ভিক্ষুসংঘের মহন্ত, আমার ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে ভিক্ষুসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে নিতান্তই অজ্ঞ এবং মূর্খ।"

আনন্দ স্তব্ধ হয়ে ভগবান বুদ্ধের কথাগুলি শুনছিলেন। বুদ্ধ থামতেই আনন্দ কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন—"হে তথাগত! ভিক্ষুসংঘের জন্যে আর কিছু বলবেন কী?"

বুদ্ধের তপোময় শরীরে ছড়িয়ে থাকা স্নিগ্ধতায় এক বিন্দু ক্ষুব্ধতার উদয় হল। কপালের রেখাগুলি সামান্য হলেও কুঞ্চিত হল। এক মুহূর্ত পরে বুদ্ধ বললেন— "তথাগত ভিক্ষুসংঘের জন্য আর কী বলবে! আমার বয়স এখন আশি বছর।" বুদ্ধের দৃষ্টি উদাস— কোন্ সুদূরে তা হারিয়ে গেছে কে বলবে। একটু থেমে আবার বললেন—"এখন এই শরীর ছেঁড়া কাপড়ের ন্যায় পুরনো জীর্ণ হয়ে গেছে। জানো আনন্দ, যেমন কোনো পুরনো শকট (গোরু বা ঘোড়ায় টানা গাড়ি) ভেঙে চুরে গেলে তাকে এখানে তাপ্পি দিয়ে, ওখানে বেঁধে কোনোমতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তথাগতের শরীরটাও এখন সেই জীর্ণ শকটের ন্যায় হয়ে পড়েছে। কোনোমতে বেঁধে-বুঁধে, জোড়াতাপ্পি লাগিয়ে একে চালানো হচ্ছে।" একথা বলার পরমুহূর্তেই বুদ্ধের মুখখানি দিব্য তেজে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি আবার বললেন—"আনন্দ, তথাগত মনে কোনো চিন্তাকেই স্থান দেয় না। কোনো-কোনো বেদনা যখন নিরুদ্ধ হয়ে ভিতরে চেপে যায়—তখন একাগ্রচিত্তে বোধির সাহায্যে নিজের অন্ধকার পথ আত্মজ্ঞানের আলোর প্রকাশে আলোকিত হয়ে ওঠে। তাই আনন্দ সবচেয়ে বড়ো কথা, তোমরা সবাই আত্মোন্মুখী হও। আত্মশরণ, অনন্য স্মরণ, ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা, ধর্মের শরণাগতি নিয়ে মুক্তকণ্ঠে পরিব্রাজন করো।"—বলে বুদ্ধ নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় শান্ত, অচঞ্চল, সাগরের ন্যায় গম্ভীর কিন্তু প্রশান্ত হয়ে বসে রইলেন। সেই দেবমূর্তি ধ্যানস্তব্ধ অস্তিত্বের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দের দুই চোখ জলে ভরে উঠল। .....

বুদ্ধ সারাটা জীবন ধরে আত্ম-নির্ণয়, আত্ম-অবলম্বন এবং বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ করার কথা বলে গেছেন। আশি বছর বয়সে বুদ্ধ শরীরের দিক থেকে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কথামতো—তিনি সেই পুরনো গাড়িকেই বেঁধে-ছেদে কোনোমতে চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনোদিন কেউ তাঁর মুখে হতাশার কালো ছায়া দেখেনি। তিনি অফুরন্ত আশা ও অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন।

বুদ্ধ রমণীয় স্থানগুলিতে পরিব্রাজন করতে ভালোবাসতেন। সারা জীবন ধরে যে সমস্ত সুন্দর, রমণীয় স্থানগুলি পরিব্রাজন করেছিলেন— সেগুলির মধুর স্মৃতি তখনও তাঁর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। একদিন ভোজন করবার পর তিনি বেণুগ্রাম থেকে চাপাল চৈত্যে ভ্রমণ করতে গেলেন। চৈত্য দেবগণের নামে উৎসর্গীকৃত চবুতরাকে বলা হত। সেকালে চৈত্যে মূর্তি স্থাপন করা হত না। সাধারণত কোনো বড়ো উদ্যানের ভিতরে চৈত্য স্থাপন করা হত।

নিজের ফেলে আসা স্মৃতি আর পরিব্রাজনের প্রিয় স্থানগুলির কথা বুদ্ধের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অস্ফুটস্বরে পাশে হাঁটতে থাকা আনন্দকে বলে উঠলেন—

"জানো আনন্দ— বৈশালী, আমার কাছে বড়ো রমণীয়। এমন বহু স্থান আছে যার আকাশ, বাতাস, গাছপালা সব—আমার কাছে বহুদিনের থেকে আপন। উদয়ন চৈত্য, গৌতমক চৈত্য, সপ্ত-আম্রক চৈত্য, সারদন্দ চৈত্য, চাপাল চৈত্য, প্রতিটিই অপূর্ব। কপিলবস্তুতে ন্যগ্রোধ রাম, রাজগৃহে গৃদ্ধকূট, প্রতিটি স্থানই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। জানো—এই স্থানগুলির সৌন্দর্যপূর্ণ অবস্থান আমার মনের কোণে সর্ব অবস্থায় জাগরূক হয়ে রয়েছে। বৈভার পর্বতের সানুদেশে কালশিলা, সীতবনে সর্প-শৌণ্ডিক পাহাড়, প্রত্যেকটি স্থান মনোলোভা এবং অতুলনীয়। তপোদপারাম, বেণুবন-কলন্দক-নিবাপ, জীবকাম্রবন, মদ্রকুক্ষিমৃগদাব—আহা,

তাদের শোভা!'' বলে বুদ্ধ চোখ বুজলেন।

আনন্দ তখনও বুঝতে পারেননি যে তথাগত বুদ্ধ মনে মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। যে জীবন, ত্যাগ, তপস্যা, বোধিজ্ঞানের দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে এসেছে, এবার তার বিদায় নেবার পালা। ধীরে ধীরে তিনি পরিচিতদের থেকে বিদায় নিতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি তাঁর প্রিয় বৈশালী, লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাজধানীর লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সবার চোখ অশ্রুসজল। একি! ভগবানের আচরণে এমন বিদায়ের সুর থেকে থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে কেন? বুদ্ধ বেণুগ্রামের কূটাগারশালায় গেলেন। এটি সেই স্থান যেখানে আজও একটি অশোক স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। বুদ্ধের স্থির, শান্ত মুখমণ্ডলে অনাবিল আনন্দ ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হচ্ছে না শিষ্যদের। বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডেকে উপদেশ দিলেন, তারপর শেষবারের মতো বৈশালীতে ভিক্ষা করতে গেলেন। নগরের বাইরে বেরিয়ে ধীরপদে এগোতে এগোতে তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর দিকে একবার ফিরে তাকালেন। তারপর গম্ভীর, নিষ্কম্প অথচ করুণ স্বরে বলে উঠলেন—''আনন্দ, তথাগতের এই শেষ বৈশালী দর্শন।''

একটি ছোট্ট বাক্য, একটি শব্দ ..... অথচ তা অনন্ত ঝংকার নিয়ে ঘণ্টধ্বনির রেশের মতো বাজতে লাগল অনেকক্ষণ। বিদায়। তথাগতের বাণী আর বৈশালী শুনতে পাবে না, তথাগতের চরণ আর বৈশালীর নগরপথ পরিভ্রমণ করবে না। আনন্দ স্তব্ধ, হতবাক, বিমূঢ়।

বৈশালী থেকে বুদ্ধ কুশীনারার দিকে এগিয়ে চললেন। পথে ভণ্ডগ্রাম, অম্বগ্রাম, জম্বুগ্রাম এবং ভোগনগর নামক লোকলয়গুলি তিনি পেরিয়ে গেলেন। এখনকার যুগে, আধুনিককালে সেই স্থানটি বা স্থানগুলি কোথায় তা বলা কঠিন। নিশ্চয় অঞ্চলগুলি বৈশালী থেকে কুশীনারা যাওয়ার পথের মাঝেই অবস্থিত— সেক্ষেত্রে এখনকার ভারতে মুজফ্ফরপুর, চম্পারণ, ছাপরা এবং দেওরিয়া জেলাগুলিতেই স্থানগুলি খোঁজা উচিত। ভোগনগর সম্ভবত গণ্ডকী নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত। সেখান থেকে বুদ্ধ পাবা (পাওয়া) পৌঁছলেন। মল্লদের নয়'টি গণরাজ্যের মধ্যে পাবা একটি রাজ্যের রাজধানী ছিল। স্থানটি এখনকার 'পড়রৌনা'র আশপাশে কোথাও হবে। 'পপৌর' নামক গ্রামটি আজও সেখানে অবস্থিত, যেটি পাবাপুরের বিকৃত উচ্চারণ থেকে তৈরি হয়েছে। পাবায় পদার্পণ করলেন তথাগত। তিনি আশ্রয় নিলেন স্বর্ণকার চুন্দের আমবাগানে। চুন্দ আগামী কাল বুদ্ধকে ভোজনের আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ এবং তাঁর সংঘের জন্যে কী উপাদেয় খাদ্য চুন্দ পরিবেশন করবেন— সেই নিয়ে তিনি চিন্তায় ছিলেন এবং সেই সময় প্রচলিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদেয় খাদ্য শূকরের সুস্বাদু মাংস রান্না করে সবাইকে খেতে দিয়েছিলেন। শূকরের মাংস—'একেবারে ছানাও নয়, একেবারে বুড়োও নয়— মোটামুটি এক বছর বয়স যেটির—তা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু'। সে যুগে শূকর অভক্ষ্য বস্তু (খাওয়ার জন্যে নিষিদ্ধ) ছিল না। মনে হয় গ্রামের একটি শূকরকেই খাদ্যবস্তু রূপে উপাদেয় এবং সুস্বাদু ভাবে রান্না করে পরিবেশন করা হয়েছিল। বুদ্ধের জন্যে এটি তাঁর বৃদ্ধ, দুর্বল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত গুরুপাক খাদ্য ছিল। কিন্তু চুন্দের আন্তরিকতাকে বুদ্ধ উপেক্ষা করে দুঃখ দিতে চাননি তাই অম্লানবদনে তিনি সেই গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করলেন।

চিনা ভাষায় অনূদিত সূত্রগুলিতে বুদ্ধের বৈশালী থেকে আম্রগ্রাম, বেণুগ্রাম, ভোগনগর এবং পাবা হয়ে কুশীনারায় যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। তাতেও বলা আছে যে স্বর্ণকার চুন্দ

বুদ্ধকে অন্ন (ভাত) এবং তিন বছরের শূকরের সুস্বাদু মার্দব (মাংসের কিমা) ভোজন করিয়েছিলেন।

এখানকার আতিথ্য গ্রহণ করে আবার বুদ্ধের পথ চলা শুরু হল। পথে অসম্ভব দুর্বলতার জন্য বেশ কয়েকবার তাঁকে বসতে হল। তিনি এগিয়ে চলেছিলেন কুশীনারার দিকে। চুন্দের দেওয়া গুরুপাক খাদ্য খাওয়ার ফলে বুদ্ধের ভয়ংকর উদরাময় হল। যাতে কেউ স্বর্ণকার চুন্দের উপর কোনোপ্রকার দোষারোপ না করে, তাই অম্ববনের ভেতরে বড়ো চাদর বিছিয়ে শুয়ে তিনি আনন্দের কাছে বললেন যে—সুজাতার দেওয়া ক্ষীর আর চুন্দের দেওয়া খাদ্যে কোনো গুণগত ফারাক নেই। একটির দ্বারা বোধিপ্রাপ্ত হওয়া আরও সুগম হয়ে উঠেছিল এবং অন্যটির দ্বারা চিরমুক্তির পথ, নির্বাণের পথ আরও সুগম হয়ে উঠবে। বুদ্ধ বললেন—"হে আনন্দ, হয়তো কেউ স্বর্ণকার চুন্দকে বিব্রত করতে পারে এই বলে যে—'আজ তোর দেওয়া খাদ্য খেয়ে তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়ে নির্বাণলাভ (দেহরক্ষা) করেছেন।'—যদি কেউ, কোনোভাবে তাঁর মনে এরূপ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ গ্লানি উৎপন্ন করায়, তাহলে আনন্দ, তুমি তাঁকে সেই মহাপাতকের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত কোরো।"—বুদ্ধের মুখে বেদনার বা পীড়ার এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই—শান্ত মুখখানির উপর অপার্থিব প্রশান্তি এবং গাম্ভীর্য থম থম করছে। বুদ্ধ আবার বললেন—"তুমি চুন্দকে বলবে— যে ভাই, তোমার কোনো দোষ হয়নি, তাই দুশ্চিন্তা করারও কোনো কারণ দেখি না। হে আয়ুষ্মান, তুমি বিশেষ পুণ্য অর্জন করেছ, কারণ তোমার 'অন্নপিণ্ড' আহার করে তথাগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। সে হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাকে বোলো, যে আমি এই কথাগুলি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের মুখ থেকে শুনেছি। সেই দুটি পিণ্ডই তথাগতের জীবনে সমান মূল্যবান, সমান ফলপ্রদ। প্রথমটি সেইটি, যেটি ভোজন করে (সুজাতা প্রদত্ত ক্ষীর) তথাগত বোধিলাভ করেছিলেন—এবং দ্বিতীয় সেইটি যেটি আহার করে তথাগত দুঃখ-কারণ-রহিত হয়েছেন (মহাপরিনির্বাণলাভ করেছেন)।"

অসুস্থ শরীরে বুদ্ধ এগিয়ে চললেন। তাঁর দেহত্যাগের নির্ধারিত স্থান, তাঁর পথ চেয়ে রয়েছে। হিরণ্যবতী নদীর তীর—আজও সেটি তথাগত বুদ্ধের অমর স্মৃতিকে বুকে ধরে বয়ে চলেছে—নাম এখন তার সোনানালা। কুশীনারা এসে গেছে। তারপরেই মল্লদের শালের বন। সেখানেই দুটি যমজ শালবৃক্ষের মাঝখানে একটি শয্যা রচনা করে দেওয়া হল। তথাগত ধীরপদে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর অপার্থিব প্রশান্তি—শান্তভাবে এক পা, এক পা করে এগিয়ে অবশেষে তিনি সেই শয্যায় শয়ন করলেন। উত্তরদিকে মাথা, দক্ষিণদিকে পা দিয়ে তিনি ডান কাত হয়ে শুলেন। ইতিহাসের পাতায়, শ্রদ্ধাবানের হৃদয়ে, করুণার প্রতিটি বিন্দুতে লেখা হয়ে গেল চারটি স্থানের নাম। শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদের এই চারটি স্থানই দর্শনীয়—(১) জন্মস্থান—লুম্বিনী (২) বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির স্থান—বোধগয়া (৩) ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান—(সারনাথ) এবং (৪) নির্বাণ স্থান—কুশীনারা।

বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বুদ্ধ পৌঁছেছিলেন সেখানে। চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস, পাতার শিরশির শব্দ—আর দিগন্তে, আকাশে গোল থালার মতো উঠে আসা চাঁদ তার জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব।

এখনও আট থেকে নয় ঘন্টা নির্বাণের জন্যে বাকী ছিল। বুদ্ধ একেবারে স্থির, শান্ত—কিন্তু পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত। স্পষ্ট এবং গম্ভীরস্বরে তিনি আদেশ করলেন—"ভিক্ষুগণ যেন আমার শরীরটিকে নিয়ে পূজা-অর্চনায় মেতে না ওঠে। যে শরীর সর্বদুঃখের আকর—তাকে নিস্পৃহ, উদাসীন হয়ে ত্যাগ করাই আদর্শ ত্যাগীর পন্থা।"

এরপর বুদ্ধ চরম নিস্পৃহতার সঙ্গে বললেন—"এই শরীরটাকে সংরক্ষণ করবে না—দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এটিকে পুড়িয়ে ফেলবে।"

আনন্দ এমন কথা শুনে আর থাকতে পারলেন না—তিনি কুটিরের ভিতরে ঢুকে একটা খুঁটি আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে অনুপস্থিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন—"আনন্দ কোথায়?"—তাঁকে বলা হল যে আনন্দ শোকে আকুল হয়ে কাঁদছেন। তথাগত বললেন—"ওকে ডেকে নিয়ে এসো।"

আনন্দ এসে দাঁড়ালেন গুরুর কাছে— চোখে তাঁর তখনও জল। ভগবান বুদ্ধ সস্নেহ দৃষ্টিতে শিষ্যের দিকে তাকালেন—। তারপর বাৎসল্যভরা কণ্ঠস্বর গম্ভীর উপদেশের রূপ নিল।—

"আনন্দ, শোক কোরো না, কেঁদ না। আমি তো আগেই বহুবার বলেছি—সব প্রিয়জনদেরই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। তাঁদের কি আর ফিরে পাওয়া যায় আনন্দ, না, তাতো হয় না। যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে (বা) জন্মেছে—তার বিনাশ হবেই। 'এটা যেন নাশ না হয়—নষ্ট না হয়'—এটা সম্ভব নয়। তুমি তো কত বড়ো উত্তম-জ্ঞানী পুরুষ—তুমি তথাগতের সঙ্গে বহুদিন কাটিয়েছ, উত্তম শ্রম ও সেবার দ্বারা তথাগতের সঙ্গে তোমার সাহচর্য তো আরও নিবিড়। তাই— শোক কোরো না, শান্ত হও।"

কুশীনারা মল্লদের গণরাজ্যের একটির রাজধানী ছিল। মহাপরিনির্বাণের পূর্বে বুদ্ধ আনন্দকে পাঠিয়ে সেই স্থানের মল্লগণের উদ্দেশে বললেন—

"হে বাশিষ্ঠগণ! আজ রাতের শেষ প্রহরের দিকে তথাগতের মহাপরিনির্বাণ হবে। চলো, চলো, দেরি কোরো না, পরে আপশশ করতে বোসো না যে—'আমাদেরই গ্রামে তথাগতের পরিনির্বাণ হল—অথচ শেষ সময়ে আমরা তাঁর পুণ্য দর্শনটুকুও পেলাম না'।"

এই মর্মান্তিক খবর পেয়ে মল্লরা স্ত্রী-পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। মেয়েরা আলুথালু বেশে, খোলা চুলে কাঁদতে কাঁদতে তথাগতের চরণতলে ছুটে এল।

সে সময় রাত আর দিনের ছয়টি প্রহর মানা হত। রাত্রির তৃতীয় যাম মানে রাতের শেষ চারটি ঘণ্টা, কারণ বৈশাখ মাসে রাত ছোটো হয়। প্রথম যাম মানে রাত ১০টা পর্যন্ত মল্লরা ভগবান বুদ্ধের দর্শন এবং বন্দনা শেষ করে নিল।

কুশীনারায় সুভদ্র সাধু বসবাস করত। সে যখন এই সংবাদ পেল, তখন ভাবল—"এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। এই ভেবে, সে শালবনে এল এবং আনন্দের কাছে নিবেদন করল যে সে বুদ্ধের দর্শন করতে চায়। আনন্দ শুনে মানা করলেন—'না না! এখন তথাগতের দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। ভগবানের কষ্ট হবে একথা শুনলে।' বুদ্ধেব কানে তাদের বার্তালাপ গিয়ে পৌঁছল। তিনি বললেন—'না আনন্দ। সুভদ্রকে বারণ কোরো না।

সুভদ্রকে তথাগতের দর্শন পেতে দাও। সুভদ্র যা জিজ্ঞেস করবে, তা পরম জ্ঞানের ইচ্ছা প্রসূত- হয়েই করবে এটা জেনে রেখ। সে আমায় কোনোভাবেই কষ্ট দিতে চায় না। জিজ্ঞাসিত হলে আমি যা তাকে বলব— সে সেটাকে সত্বর জেনে নেবে'।"

সুভদ্র ভগবানের কাছে পৌঁছে নিজের প্রশ্নগুলো সামনে রাখলেন। সুভদ্র বুদ্ধের অন্তিম শিষ্য ছিলেন।

বুদ্ধ আনন্দকে বললেন—"আনন্দ, হয়তো তোমার মনে হতে পারে যে প্রয়াণমুখী গুরু উপদেশ দিয়েছেন—কিন্তু আমাদের শাস্তা (উপদেশক) কে হবেন? এমনটা ভেব না। আমি যে বিনয় এবং ধর্মের উপদেশ দিয়েছি, আমার পরে সেগুলিই তোমার গুরুর কাজ করবে। মনে রেখ, আজকাল ভিক্ষুরা যেমন একে অন্যকে সম্বোধন করে, আমার পরে তারা যেন সেরূপ না করে। যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু তিনি নবাগত বা বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুকে 'আয়ুষ্মান' বলে সম্বোধন করবেন এবং বয়োকনিষ্ঠ ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের 'ভন্তে' বলে সম্বোধন করবে। প্রয়োজন হলে আমার পরে ছোটোখাটো ভিক্ষু নিয়মগুলিকে বাদ দিতে পারো। এবং মনে রেখ, আমার পরে ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড দেওয়া উচিত।

আনন্দ প্রশ্ন করলেন—"ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড কাকে বলে?"

বুদ্ধ বললেন—"আনন্দ, ছন্ন অন্যান্য ভিক্ষুদের যা ইচ্ছা তাই বলুক, ভিক্ষুদের কোনোভাবেই তার সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়—তাকে উপদেশ দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই।"

রাত আরও গভীর হয়ে এল। জ্যোৎস্নায় আকাশ প্লাবিত। চারিদিক এক অপার্থিব নৈঃশব্দে থমথম করছে। বুদ্ধ এবার তাঁর সংঘের ভিক্ষুদের ডাকলেন—

"ভিক্ষুগণ, যদি বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ সম্বন্ধে কিছু জানবার বাকী থাকে বা কোনো সংশয় থাকে, তাহলে জিজ্ঞেস করে নাও। পরে এ নিয়ে আপশশ কোরো না যে বুদ্ধ স্বয়ং সামনে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ভগবানের কাছে একবারও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।"

বুদ্ধের মুখ থেকে শেষ উপদেশ উচ্চারিত হল—

"যা কৃত, যা সৃষ্ট, তা নাশ হবেই, শেষ হবেই। তাই আলস্য না করে জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে তাড়াতাড়ি এগোও। চিনা পিটকেও এই সূত্রটির অনুবাদও একইরকম করা হয়েছে।—'ব্যয়ধর্মাঃ সংস্কারাঃ, অপ্রমাদেন সম্পাদয়েথাঃ'।"

নিজের এই শেষ বাক্যটিতে তিনি দুটি বস্তুর উপর জোর দিয়েছিলেন। প্রথমটিতে তাঁর প্রধান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি—'সব বস্তুই পরিবর্তনশীল' আর দ্বিতীয়টিতে নিজের লক্ষ্য প্রাপ্তিতে আলস্য বা প্রমাদ না করে এগিয়ে যাওয়ার উপদেশ।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভরা রাত। ফুটফুটে চাঁদের আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। শালের বৃক্ষগুলির ডালে ডালে সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। আজও শালের ফুল ফুটলে, দূর-বহুদূর থেকে তার সুগন্ধ পাওয়া যায়। সংঘের সব ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা সমবেত হয়ে বসেছিলেন বুদ্ধের কাছে। ভগবানের দুজন সর্বপ্রধান শিষ্য—মহ্যাত্যাগী সারিপুত্ত এবং মোগ্গলান—দুজনে বহু আগেই দেহত্যাগ করেছেন। এঁদের পরে ছিলেন মহাকাত্যায়ন, যিনি সে সময় সুদূর অবন্তীরাজ্যে (উজ্জয়িনী) ছিলেন। এরপরে প্রধান ছিলেন মহাকাশ্যপ। তিনিও সেদিন উপস্থিত ছিলেন না।

রাতের শেষ প্রহরে বুদ্ধ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ভগবানের মহাপরিনির্বাণের পর ভিক্ষুদের মধ্যে অনেকেই উচ্চৈঃস্বরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন—কেউ শোকার্ত হয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন, কেউ অজ্ঞান হয়ে কেটে ফেলা গাছের মতো পড়ে গেলেন। সবার এক কথা—ভগবান খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কয়েকজন ভিক্ষু ছিলেন যাঁরা অতি কষ্টে শোক সংবরণ করে বুদ্ধের 'সবই অনিত্য'—এই চরম ও পরম সত্য বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

বুদ্ধের দিব্য দেহ নিথর, স্তব্ধ, নিশ্চুপ। অনুরুদ্ধ শোকার্ত ভিক্ষুদের সামনে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন—

"হে আয়ুষ্মানগণ! আপনারা শোক করবেন না, কাঁদবেন না। ভগবান তো বলেছেনই—(একদিন) সব প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।"

অনুরুদ্ধ এবং আনন্দ বাকী রাতটা ধর্মচর্চায় কাটালেন। সকালে অনুরুদ্ধ আনন্দকে বললেন—"হে আনন্দ! কুশীনারা গিয়ে সেখানকার মল্লদের বলুন—বাশিষ্ঠগণ, ভগবান মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। এখন যা করা উচিত তাই করো।"

কুশীনারার জনসাধারণ বুদ্ধের দাহ-সংস্কারের বিরাট আয়োজন করেছিল। আটজন মল্ল অধিপতি স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে বুদ্ধের পবিত্র মরদেহ কাঁধে করে উত্তর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে পূর্ব দ্বার দিয়ে বেরিয়ে 'মুকুটবন্ধন' নামক চৈত্যের কাছে দাহকার্যের স্থানে নিয়ে যান। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ এসে উপস্থিত হয়েছেন। তুমুল শোকার্ত ক্রন্দন আর অশ্রুর মধ্যে ভগবান বুদ্ধের চিতাতে অগ্নিসংযোগ করা হল। দাহকার্যের পরে তাঁর পূত অস্থিগুলি ভাগ করে দেওয়া হল। যেগুলির উপর বৈশালীতে, কপিলবস্তুতে, অল্লকপ্পতে, রামগ্রামে, বেটদ্বীপে, পাবাতে এবং কুশীনারায় স্তূপ নির্মিত হয়েছে। দ্রোণের ব্রাহ্মণগণ এবং পিপ্পলীবনের মৌর্যরা অস্থি না পেয়ে শীতল দেহভস্মের উপরই স্তূপ নির্মাণ করে।

এইভাবে ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র তাঁর জীবনের শেষ বছরটি সমাপ্ত করেন।

# বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব এবং জীবনদর্শন

## ১ ব্যক্তিত্ব

কোনো ঐতিহাসিক মহাপুরুষের তুলনা পৌরাণিক দেব-দেবীদের সঙ্গে করাটা ঠিক নয়, কিন্তু পৌরাণিক শব্দাবলী ব্যবহার করলে আমরা জানতে পারব যে বুদ্ধ একজন ষোলোকলায় পূর্ণ পুরুষ ছিলেন। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বুদ্ধ যেমনটি পূর্ণ পুরুষ ছিলেন— সেরকম পাওয়া যায় না। মহাপুরুষদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যাঁরা ভীষণ উর্বর মস্তিষ্কের, তাঁদের প্রতিভা অসাধারণ, প্রভাব সুদূরগামী। কিন্তু হৃদয়ের মাধুর্যে তাঁরা কোনোভাবেই মহান নন। অন্য এমন অনেকে আছেন—যাঁরা নিজে বিশাল হৃদয়ের, কিন্তু তাঁদের মস্তিষ্ক মোটেই প্রতিভাসম্পন্ন, উর্বর এবং জ্ঞানগর্ভ নয়। বুদ্ধ মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দুটিতেই অতুলনীয়, অনন্যসাধারণ ছিলেন। আড়াই হাজার বছরে, এমন বহু শ্রদ্ধাজনিত সত্য, সত্যমিশ্রিত কল্পনা এবং কাল্পনিক প্রশংসার স্তর বুদ্ধের ব্যক্তিত্বকে প্রায় ঢেকেই ফেলেছে। তবুও, সমান্য নজর দিলেই আমরা দেখতে পাব যে তিনি প্রচুর অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভিড়েও কোহিনূরের ন্যায় আপন মহিমায় ঝকঝক করছেন। পাশ্চাত্য বিদ্বানরা যখন প্রথম বুদ্ধের কথা জানতে পারলেন, তখন অনেকেই তাঁকে হিন্দুদের অবতারবর্গের ন্যায় একজন কাল্পনিক ব্যক্তিই ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষে ঐতিহাসিক তথ্যের সামনে মাথা নোয়াতেই হল। বুদ্ধকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মানতেই হল তাঁদের। যখন বুদ্ধের নির্বাণের আনুমানিক দুই-আড়াইশো বছর পরে পিপরহবা-তে এবং অন্যান্য স্থানে প্রাচীন অক্ষরে উৎকীর্ণ কৌটোয় তাঁর অস্থিগুলি আমাদের সামনে এল— তখন সেই জাজ্বল্যমান প্রমাণের ভেতর দিয়ে যেন বুদ্ধ বলে উঠলেন—"এই আমিই সেই, যাকে শ্রমণ গৌতম নামে অভিহিত করা হত। পঁয়তাল্লিশটা বছর ধরে যে সাঁওতাল পরগনার জেলা থেকে থানেশ্বর এবং বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয়ের তরাই অবিধি পরিব্রাজন করে বেড়িয়েছে।"

আগেই বলেছি, পরম্পরা অনুসারে বুদ্ধের নির্বাণ খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৪-এ এবং জন্ম তারও আশি বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪-এ হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ভগবানের নির্বাণলাভের ২৫০০ বছর পূর্ণ হল। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের থেকে এই গণনাটি যাট বছর বেশি বলে মনে হয়। সেদিক দিয়ে দেখলে নির্বাণ খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩-৮৪-তে হয়েছিল। এই মতটি মান্য হলে অন্যান্য ঐতিহাসিক উল্লেখগুলির সঙ্গতি বর্তমান থাকে। পরম্পরা অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪-এ সিদ্ধার্থের লুম্বিনীতে জন্ম। ২৯ বছর বয়সে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৫, ঐতিহাসিক মতে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৫) তিনি গৃহত্যাগ করেন। ছয় বছর ব্যাপী উগ্র তপস্যার পর, সেটিকে ব্যর্থ জেনে ৩৫ বছর বয়সে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৯-৫২৯) তিনি নিজের চেষ্টায় সেই দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেন—যা বুদ্ধের যোগ, দর্শন এবং আচারশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। এই তত্ত্বকেই মধ্যম মার্গ, চারটি আর্যসত্য, অনিত্যবাদ ক্ষণিকতার সিদ্ধান্ত বা প্রতীত্যসমুৎপাদ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ৩৫ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত টানা ৪৫ বছর (ঐতিহাসিক মতে খ্রিস্টপূর্ব ৫২৮-৪৮৩

এবং পরম্পরা অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৯-৫৪৫ অবিধি) তিনি কল্যাণের পথ দেখিয়ে, হাজার হাজার মানুষকে ধর্মের রাস্তা, প্রেম, দয়া ও করুণার রাস্তা দেখিয়ে গেছেন।

বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই তাঁর খ্যাতি তাঁর বিচরণ ক্ষেত্রের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুদূর গুজরাতের শূন্য প্রান্তর থেকে সমুদ্রতটের নিকটবর্তী অঞ্চলের ধনাঢ্য শেঠরা এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তক্ষশিলার রাজা কষ্ফিফণ বুদ্ধের চরণে হয়েছেন শরণাগত। সমকালীন বড়ো বড়ো পণ্ডিত, মেধাবী এবং আদর্শবাদী পুরুষেরা বুদ্ধের কাছে মাথা নত করেছেন। সারিপুত্ত, মৌদ্‌গল্যায়ন, মহাকাশ্যপের ন্যায় অঙ্গ-মগধ নিবাসী সে যুগের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বুদ্ধের উপদেশে জীবনের পরম পাথেয় লাভ করে শান্তি পেয়েছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের পুরোহিত পরম তেজস্বী, মহাপণ্ডিত, মহাকাত্যায়ন বুদ্ধের চরণে মাথানত করে প্রমাণিত করলেন যে জম্বুদ্বীপে একটি অদ্বিতীয় সূর্যের উদয় হয়েছে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যেও বুদ্ধের শিষ্যের সংখ্যা কম নয়। প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব, দুদিকেই তিনি এত আকর্যক ছিলেন যে, তাঁর সামনে এলেই, সেই পরম দিব্যদেহ দর্শনমাত্রেই হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হত। কঠোর তপস্যার সময় ছয়টি বছর যাঁরা বুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন, বুদ্ধ তপস্যা ত্যাগ করার পর তাঁকে আচার ভ্রষ্ট ভেবে কৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ আদি পাঁচ ভিক্ষু বুদ্ধকে ছেড়ে ঋষিপতন মৃগদাবে (সারনাথে) চলে যান। বুদ্ধ তাঁর নতুন তত্ত্বের দ্বারা এই নিরাশ হওয়া পাঁচজন ব্যক্তিকে উজ্জীবিত করতে চাইলেন। দূর থেকে ভগবান বুদ্ধকে আসতে দেখে সেই পাঁচজন সাধু নিজেদের মধ্যে এই বলে পরামর্শ করলেন যে—"বন্ধুগণ! ওই শ্রমণ গৌতম সাধনা-ভ্রষ্ট হয়ে আমাদের দিকেই আসছে। একে আমাদের অভিবাদন করাও উচিত নয়, প্রত্যুত্তর দেওয়াও উচিত নয়।" কিন্তু দিব্যদেহী বুদ্ধ এগিয়ে আসতেই একজন এগিয়ে এসে বিনীতভাবে তাঁর হাত থেকে পাত্র আর চীবরটি ধরল। একজন সসম্মানে আসন বিছিয়ে দিল। আর একজন বুদ্ধের পা ধুইয়ে দেবার জন্যে জলপিঁড়ি এনে দিল।

সত্যিই, তিনি এতই মোহময়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছিলেন যে, অনেকেই এটিকে তাঁর মত পালটানোর জাদু (আবর্তনী মায়া) বলে অভিহিত করতেন। নালন্দার শেঠ উপালিকে যখন বুদ্ধের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত দেখে কেউ কেউ টিটকারি দিত, তখন তিনি (উপালি) বলতেন—"আবর্তনী মায়া অত্যন্ত সুন্দর, আবর্তনী মায়া অত্যন্ত কল্যাণকর। যদি আমার স্বজাতিভুক্ত কেউ এই আবর্তনী মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত হয় তাহলে দীর্ঘকাল ধরে তার হিত হবে, সুখ হবে, জেনে রেখে দিও।"—সত্যিই বুদ্ধ বিশেষভাবে তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্বের দ্বারা মন এবং মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতেন।

বুদ্ধ নিরূপিত মূল দর্শনতত্ত্বটি হল—'প্রতীত্যসমুৎপাদ'—অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য জগতের যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু সবই নাশবান, অনিত্য, ক্ষণে ক্ষণে এর মূলগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এটা বোঝানো এত সহজ ছিল না। কিন্তু বুদ্ধ কঠিন তত্ত্বকেও জীবনের উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত করে এত সহজ করে বোঝাতেন যে প্রতিটি উপমার সঙ্গে একটি করে শক্ত তত্ত্বের গিঁট আলগা হয়ে যেত। অল্প জ্ঞান-বুদ্ধি যাঁর সেও স্পষ্ট সুন্দরভাবে কঠিন তত্ত্বটির অন্তর্নিহিত সত্যটাকে ধরতে পারতেন। আর যাঁরা জ্ঞানী ও মেধাবী—তাঁদের কথা তো বলাই বাহুল্য। দুটো কথার পরেই তাঁরা এই অনন্যসাধারণ তত্ত্বের ভাব উপলব্ধি করে অভিভূত হয়ে পড়তেন।

ভিক্ষু অশ্বজিতের শান্ত হাবভাব দেখে পরিব্রাজক সারিপুত্ত তাঁর দিকে আকৃষ্ট হলেন। তিনি অশ্বজিতের মনের ভাব জানার চেষ্টা করলেন। অশ্বজিত বললেন—"আমি এই ধর্মে নতুন এসেছি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলতে আমি অক্ষম।"

সারিপুত্ত অনুরোধের সুরে বললেন—"আচ্ছা, অল্প যা তোমার মনে হয়েছে, তাই বলো।"

উত্তরে অশ্বজিত যে গাথা বললেন—সেটি ভারতে এবং ভারতের বাইরে কোটিবার পাথর, ধাতু, কাগজ ও মাটিতে লেখা হয়েছে। প্রতিটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশে এই গাথা উৎকীর্ণ অসংখ্য মুদ্রায়। কী সেই বিখ্যাত বক্তব্য? সেটি হল—

"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা হেতুং তেসং তথাগতো আহ।
তেসং চ যো নিরোধো, এবং বাদী মহাসমণো॥

"যা পদার্থ বলে কথিত, তাই হেতু হতে উৎপন্ন। তাদের হেতু এবং সেগুলির নিরোধের পথও তথাগত বলেছেন—যিনি বলেছেন তিনি মহাশ্রমণ।"

বুদ্ধ যাবতীয় ধর্মের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বস্তুগুলিকে সকারণ (কারণসহিত) উৎপত্তিমান বলে অভিহিত করেছেন। এই একটি দৃষ্টিই বুদ্ধের অনিত্যবাদ অনাত্মবাদকে মেধাবী সারিপুত্তের সামনে উন্মোচিত করে দিল। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ভারত, দর্শনের ক্ষেত্রে সদাই অগ্রণী ছিল। বৌদ্ধবিরোধী তাঁদের প্রমাণপটু বলতেন। নালন্দার মহান দার্শনিক, অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত ধর্মকীর্তি সম্বন্ধে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলতেন—"দুরাবাধ ইব ধর্মকীর্তেঃ পন্থাঃ তৎ অত্র অবহিতেন ভাব্যং"—(ধর্মকীর্তির পথ অত্যন্ত কঠিন, তাই এখানে সাবধানে বিচরণ কোরো)

বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব কীরূপ আকর্ষক ছিল, সে সম্বন্ধে বেশ কিছু ঘটনা বর্তমান—

১. তিনি পরম করুণাময় ছিলেন। তিনি এবং তাঁর শিষ্যগণ, করুণার উপরই সবচেয়ে জোর দিয়েছেন। চুরাশি সিদ্ধদের আদিগুরু সরহপাদ করুণা এবং শূন্যতা-সমাধি এই দুটি জিনিসের উপর জোর দিতে বলেছেন। এটাও বলা হয়েছে যে এরা একে অন্যের পূরক তত্ত্ব।

ভগবান সে সময় শ্রাবস্তীর জেতবনে ছিলেন। মঠে পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি একটি কুঠুরির কাছে গেলেন। দেখলেন, একজন ভিক্ষু পেটের অসুখে ভীষণভাবে আক্রান্ত। সে মল-মূত্রের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। বুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে আনন্দকে বললেন—"আনন্দ, যাও, তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসো, এই ভিক্ষুকে আগে আমরা স্নান করিয়ে পরিষ্কার করে দিই।" আনন্দ জল নিয়ে এলে, ভগবান স্বহস্তে সেই ভিক্ষুকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর বুদ্ধ মাথার দিকে ধরলেন আর আনন্দ পায়ের দিকে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে শয্যায় নিয়ে এসে শোয়ালেন। সেই সময় বুদ্ধ অন্যান্য ভিক্ষুদের বলেছিলেন—"তোমাদের মা নেই, বাবা নেই, যে তোমরা অসুস্থ হলে তাঁরা তোমাদের সেবা করতে পারবেন। যদি তোমরা একে অন্যের সেবা না কর, তাহলে কে সেবা করবে? যে রোগীর সেবা করে, সে আমার সেবা করে।"

রোগীর সেবার সঙ্গে এমন অনেক ওযুধের প্রয়োগও বুদ্ধ পরে বলেছেন, যা অসাধারণ জীবনদায়ী। তিনি অসংখ্য প্রকার ওষুধের ব্যবহারিক প্রয়োগ জানতেন। তাই বুদ্ধকে 'ভৈষজ্য-গুরু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভৈষজ্য-গুরু থেকে, তাঁর জীবদ্দশায় যতজন রোগী না লাভান্বিত হয়েছে, তার থেকে অনেক অনেক বেশি সংখ্যায় লোকেরা লাভান্বিত হয়েছে ভৈষজ্য-

গুরুর নির্বাণের পরে। সম্রাট অশোক পশু-চিকিৎসা, মানবদেহের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভারতেই নয়, সুদূর গ্রিক দেশেও করেছিলেন। কম্বোজ, চিন ইত্যাদি দেশে বহুসংখ্যক হাসপাতাল এবং আতুর অনাথদের জন্যে আশ্রয় তৈরি করা হয়েছিল।

বুদ্ধ দুঃখে ভেঙে পড়া হৃদয়কে নিয়ে তামাশা করতেন না। তিনি সেই দুঃখ স্বয়ং হৃদয়ে অনুভব করতেন এবং তার ব্যবহারিক প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। কৃশা গৌতমীর জীবন্ত উদাহরণটি আমাদের সামনে। গৌতমী নিজের সম্বন্ধে বলছে—

নির্ধন অসহায় জেনে সবাই আমায় তিরস্কার করত, কটুকথা শোনাত।
যেদিন আমার পুত্র জন্মাল, সেদিন আমি সবার কাছে প্রিয় হলাম।
বাচ্চাটি খুব কোমল ছিল, অতি সুখে সে পালিত হচ্ছিল।
সে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল, তারপর একদিন .....
বাচ্চাটি আমায় ছেড়ে চলে গেল, অসুখে মারা গেল সে।
আমি দীনহীনা, অসহায়ের মতো শুধু কাঁদতাম
মৃত শিশুর দেহ নিয়ে শুধু বিলাপ করে ঘুরে বেড়াতাম।
কেউ বলল—'উত্তম বৈদ্য বুদ্ধের কাছে যাও'।

আমি তখন বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললাম—"আমাকে পুত্রসঞ্জীবনী ওষুধ দিন।" তিনি ধীর গম্ভীর কিন্তু অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—

"যে ঘরে কেউ মারা যায়নি, সেই ঘর থেকে একমুঠো সরষে নিয়ে এসো।"

আমি সমস্ত শ্রাবস্তী উন্মাদের মতো ছুটে বেড়ালাম, কিন্তু এমন একটিও ঘর পেলাম না। কোথায় পাব সরষে? তখন আমি উপলব্ধি করলাম মূল সত্য।

শোকে উন্মাদিনী গৌতমীর এই কথাটাই উপলব্ধি হল যে 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শুধু আমার ছেলেকেই একমাত্র মৃত্যু গ্রাস করেনি। সবাইকেই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা জানার পরেই গৌতমীর উন্মাদনা শান্ত হল, সে মূল সত্য বুঝে স্থির হল।

যে বুদ্ধ দর্শনের নিরূপণের ব্যাপারে বজ্রের চেয়েও কঠোর ছিলেন, তিনিই আবার হৃদয়ের করুণায় কুসুমের মতো কোমল ছিলেন। সারিপুত্ত, বুদ্ধের সবচেয়ে প্রিয় ও যোগ্যতম শিষ্য ছিলেন। মোগ্গলানও (মৌদ্‌গল্যায়ন) একই রকম প্রিয় এবং যোগ্য শিষ্য ছিলেন। দুজনকে দেখলে মনে হত, যেন তাঁরা যমজ ভাই। দুজনেরই দেহত্যাগ হল। সারিপুত্তের আপন জন্মগ্রাম নালন্দায় মৃত্যু হয় আর মোগ্গলান রাজগৃহে দেহত্যাগ করলেন। সংঘের প্রতিটি ভিক্ষু এই সংবাদে মর্মাহত ছিলেন। পাটলিপুত্রের সামনে গঙ্গা পার হয়ে উলকাচেলের বালুতে ভিক্ষুদের বিমর্ষ মুখে বসে থাকতে দেখে ভগবান বললেন—

"ভিক্ষুগণ, পরিষদ এখন আমার কাছেও শূন্য লাগছে। সারিপুত্ত এবং মৌদ্‌গল্যায়নের নির্বাণপ্রাপ্তির পূর্বে পরিষদ পূর্ণ বলে মনে হত। যে দিকে সারিপুত্ত এবং মৌদ্‌গল্যায়ন বিচরণ করত, আমি সে দিকের যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতাম। যেমন মহাবৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকলেও তার দুটি প্রধান শাখা (মহাস্কন্ধ) যদি ভেঙে যায়, ঠিক সেই রকম সারিপুত্ত এবং মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যু আমার কাছে।"

এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা তথাগতের ব্যথাভরা হৃদয়কেই দেখতে পাচ্ছি। একশো বছর পরে আমাদের সাংস্কৃতিক আক্ষেপ কিছুটা কমেছে, যখন লন্ডন থেকে এই দুই মহাপুরুষের অস্থি আমরা ভারতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।

বুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী সত্যকে নিস্পৃহতার সঙ্গে বলেও বিক্ষুব্ধ, সন্তপ্ত হৃদয়কে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। মৃত্যুর আগে, কুশীনারায় শালবৃক্ষের তলায় যখন বুদ্ধ শান্তচিত্তে দেহত্যাগের অপেক্ষায় ছিলেন তখন শোকার্ত, ক্রন্দনরত শিষ্য আনন্দকে তিনি জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়মের কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সুভদ্রাকে কাছে ডেকে এনে শেষ উপদেশ দেওয়া এবং তাঁকে অন্তিম শিষ্যত্বে বরণ করা— জীবনের শেষ মুহূর্তে বুদ্ধের চূড়ান্ত ঔদার্যেরই পরিচয়।

তিনি সমতার প্রচারক ছিলেন। আড়াই হাজার বছর আগে তিনি জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। এর ভিত্তি যদি সম্পত্তি না হত, তাহলে এতদিনে নিঃসন্দেহে সেটি সমূলে নষ্ট হত। তবুও বুদ্ধের প্রভাবে জাতিগত বৈষম্যের প্রভাব এতটাই শিথিল হয়ে গিয়েছিল যে ব্রাহ্মণদের আবার কৌলীন্য প্রথা চালু করে সেটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল।

অম্বপালী বৈশালীর গণিকা ছিল। সে অস্পৃশ্য নয় কিন্তু সমাজে অত্যন্ত নীচুস্তরে ছিল। পরবর্তীকালে সন্ত-মহাপুরুষরা গেয়েছেন 'গণিকা, গীধ অজামিল তার্য়ো'—(প্রভু কৃপাময়, গণিকাকে, শকুনকে এবং অজামিলের ন্যায় মহাপাপীদের উদ্ধার করেছেন)। কিন্তু তার বহু আগেই বুদ্ধ গণিকাকে উদ্ধার করেছেন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ অম্বপালীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করে তাকে সমাজে বিশেষ স্থান প্রদান করেছেন। প্রতাপী লিচ্ছবিরা অম্বপালীর ধৃষ্টতা দেখে জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পারলেন যে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ অম্বপালীর আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন, তখন তাঁরা নানাভাবে চাইলেন অম্বপালীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে। কিন্তু অম্বপালীর এক কথা—"আর্যপুত্রগণ, যদি সমস্ত বৈশালী জনপদটাই আমায় দিয়ে দাও— তবুও আমি ভগবানকে নিমন্ত্রণের এই সুযোগ ত্যাগ করব না।"

লিচ্ছবিরা আক্ষেপ করতে লাগলেন যে, "অম্বিকা সামাজিক প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করে আমাদের পরাজিত করে দিল। গণিকা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল।"

বুদ্ধ, লিচ্ছবিদের পৃথিবীতে দেবতার ন্যায় দেখতেন, কেন না, তাঁরা জনতান্ত্রিকতা এবং গণরাজ্য প্রণালীর সমর্থক ছিলেন। সংঘের মধ্যে বুদ্ধও পূর্ণ সাম্যবাদ আনতে চেয়েছিলেন। লিচ্ছবিদের দেখে তিনি ভিক্ষুদের বার বার বলেছিলেন, তাঁদের দেবপ্রতিম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আদর্শ গণরাজ্যের কথা।

যাঁরা বুদ্ধের এত প্রিয়, এত সমাদরের, সেই লিচ্ছবিরাই যখন বুদ্ধকে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন, তখন বুদ্ধ শান্ত গলায় বললেন—"আমি অম্বপালীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছি।" ....

বুদ্ধ সাদাসিধে জীবনধারার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য কাশ্যপ মিহি, দামী কাপড়ের তৈরি চাদর গায়ে দিয়েছিলেন। বসার সময় তিনি সেটিকে পাট করে পেতে রাখলেন। ভগবান বললেন—"কাশ্যপ, তোমার চাদরটি দেখছি অত্যন্ত মোলায়েম।" কাশ্যপ বুঝতে পারলেন, চাদরটি ভগবানের খুবই পছন্দ। তিনি সেটা বুদ্ধকে দিতে চাইলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—"তাহলে তুমি কী পরবে?"

কাশ্যপ বিনীতস্বরে বললেন—“ভন্তে, যদি আপনার এই বস্ত্রটি পাই, তাহলে আমি সেটি পরব।”

বুদ্ধ একটু হেসে বললেন—“আমার এই পুরনো, ছেঁড়া, সেলাই করা কাঁথা তুমি পরতে পারবে? তাহলে কিন্তু আজীবন ‘কাঁথাধারী’ (পাঁসুকূলিক) বলে পরিচিত হতে হবে। পারবে তো?”

কাশ্যপ সানন্দে ‘হ্যাঁ’ বলেন এবং নিজের সুন্দর চীবরটি দিয়ে আজীবন ‘কাঁথাধারী’ হয়েই রইলেন। বলা হয়, বুদ্ধের দেওয়া সেই চীবরটি তিনি আজীবন পরে ছিলেন। লোকমুখে কথিত—আজও তিনি গয়া জেলার কোনো এক পাহাড়ের গুহায় ঠায় বসে আছেন সেই দিনের জন্যে, যেদিন ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয় আসবেন এবং কাশ্যপ নিজের চীবরটি দিয়ে আপন কর্তব্যের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

বুদ্ধের শিষ্টাচার সম্পর্কিত একটি ঘটনা— সোরো এবং মথুরার মাঝখানে বেরঞ্জা নামে একটি লোকালয় ছিল। চাতুর্মাস্যের জন্যে বুদ্ধ সেখানেই থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন। উত্তরাপথের (পাঞ্জাব অঞ্চলের) ঘোড়া ব্যবসায়ী পাঁচশো সওদাগর সেখানেই বর্ষাবাস করছিল। বেরঞ্জার এক অতি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে তাঁর স্থানে বর্ষাবাস করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি নিমন্ত্রণের কথা একেবারে ভুলে যান। তখন দুর্ভিক্ষের সময়। চারিদিকে প্রচণ্ড খাদ্যের অভাব। সামান্য অন্নের অভাবে লোকেরা হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদার পাঞ্জাবি সওদাগরেরা সামান্য করে চাল দিতেন। সেগুলিকে কুটে যে পাতলা ফ্যানের মতো অতি হালকা অন্নজাত পদার্থ বেরোত—সবার সঙ্গে তথাগত হাসিমুখে তাই খেতেন। চাতুর্মাস্য শেষ হয়ে গেল। এখন যাবার সময়। বেরঞ্জার সেই ব্রাহ্মণটি তো ভগবানকে আহার করানোর কথা ভুলেই বসেছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁকে না জানিয়ে চলে যান কীভাবে? বুদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণকে বললেন—“ব্রাহ্মণ, আপনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাই বর্ষাবাস সমাপ্তির পর দেখা করতে এসেছি। আমরা এবার চারিকার দিকে প্রস্থান করব।”

তথাগত শিষ্টাচার পালন খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। ভগবান বেরঞ্জা থেকে সৌরেয়, সংকাস্য (সঙ্কিসা-বসন্তপুর), কান্যকুব্জ (কনৌজ) হয়ে প্রয়াগ-প্রতিষ্ঠান চলে গেলেন।

কত উদারচেতা ছিলেন তথাগত। বৈশালীর প্রধান সেনাপতি সিংহ প্রথমে তীর্থংকর মহাবীরের অনুগামী ছিলেন। বুদ্ধের আবর্তনী মায়ার প্রভাবে তাঁর মত পাল্টে যায়। বুদ্ধের মনে হল যদি আমার অনুগামী হয়ে সিংহ জৈন সাধুদের ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দেয়? এই ভেবে তিনি সিংহকে বিশেষভাবে বললেন—“সিংহ, তোমার বংশ দীর্ঘকাল ধরে, নিগণ্ঠদের (নিগ্রর্ন্থদের বা জৈন সাধুদের) বিশেষ আশ্রয়স্বরূপ হয়ে রয়েছে। তাঁরা এলে তাঁদের অন্নদান বন্ধ করবে না।”

তিনি কতই না নির্ভয় ছিলেন? খুনি ডাকাত অঙ্গুলিমাল মানুষকে হত্যা করে আনন্দ পেত। মেরে ফেলা লোকটির একটি আঙুলকে কেটে সেটাকে গেঁথে গলায় মালার মতো পরত। এর থেকেই তার নাম অঙ্গুলিমাল রাখা হয়। এই ভয়ংকর ডাকাতের ভয়ে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা সেদিকে পা বাড়ানোর নামই করত না। বুদ্ধের বিশ্বাস ছিল—‘মানব হৃদয় স্বভাবত নরম হয়েই থাকে।’ বুদ্ধকে সেই বর্জিত পথে যেতে দেখে লোকেরা

বলল—"শ্রমণ, ও পথে যাবেন না। ওখানে পথে অঙ্গুলিমাল ডাকাত থাকে। সে মানুষকে মেরে ফেলে তাদের আঙুলের মালা পরে। কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশজন লোক হলেও তারা অঙ্গুলিমালের কবলে পড়ে।"

ভগবান প্রাণের বাজি লাগিয়ে এগিয়ে চললেন। যদি মেরেও ফেলে, কোনো খারাপ কাজের জন্যে তো আর মৃত্যুবরণ করব না। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বে (আবর্তনী) পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। অঙ্গুলিমাল ডাকাত, সাধুর এহেন আচরণ দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। তবুও নিজের পাশবিক স্বভাববশত সে আর একটা আঙুল কেটে গলায় পরবার লোভ সামলাতে পারল না। কিন্তু, এ লোকটা যেন বেশ একটু অন্য ধরনের। মারবার জন্য পিছনে পিছনে দৌড়লেও সাধুটিকে বাগে পাওয়া যাচ্ছিল না। ডাকাত চিৎকার করে উঠল—"এই সাধু, দাঁড়িয়ে থাক!"

"দাঁড়িয়ে তো রয়েছি ভাই!"—তথাগতের শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ডাকাত শেষে পরাস্ত হল। পোষা জন্তুর মতো সে বুদ্ধের পেছন পেছন জেতবনে গেল। কোশলরাজ প্রসেনজিতের জিজ্ঞাসায় ভগবান প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন—"মহারাজ, এই হল অঙ্গুলিমাল।"

রাজা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তাঁর সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তবুও সাহস সঞ্চয় করে রাজা প্রশ্ন করলেন—

"তুমিই কি কুখ্যাত ডাকাত অঙ্গুলিমাল?"

উত্তর এল—"হ্যাঁ মহারাজ, আমিই সেই।"

"তোমার পিতা এবং মাতা কোন্ কোন্ গোত্রের?"

"পিতা গার্গ্য—মাতা মৈত্রায়ণী।"

গার্গ্য-মৈত্রায়ণী পুত্রের সেবা করতে পেরে প্রসেনজিত নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমাল অরণ্যবাসী, ছিন্নবস্ত্রধারী একজন গৃহত্যাগী ছিল, তার রাজার কৃপার প্রয়োজন ছিল না।

বুদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠার লোক ছিলেন না, কিন্তু রসবোধের অভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। রাজা প্রসেনজিতের রানিদের মধ্যে সোমা এবং মৃদুলা দুই বোন ছিল। খাবার পরিবেশন করার সময় তারা রাজার কাছে গেল। মহারাজ ভগবানের দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। দুই বোন সমস্বরে বলল—"মহারাজ, আমাদের দিক থেকে মৌখিক বচনের দ্বারা আপনি ভগবানকে প্রণাম জানাবেন। বলবেন তারা মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাচ্ছে।"

সরল স্বভাব মহারাজ, ভগবানের কাছে গিয়ে বললেন—"সোমা এবং মৃদুলা দুই বোন, ভগবানের সামনে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাচ্ছে।"

ভগবান বুদ্ধ মিষ্ট করে হেসে বললেন—"কেন মহারাজ, সোমা আর মৃদুলা এই দুজন আর দূত খুঁজে পেল না? তারা দুই বোন সুখী হোক—আশীর্বাদ করি।"

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ। ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং (সত্য বলো কিন্তু প্রিয় বলো, অপ্রিয় সত্য বোলো না)। কিন্তু যদি সবাই অপ্রিয় সত্য বলতে অস্বীকার করে তাহলে ভুলপথ শুদ্ধ হতে পারবে না। প্রয়োজন হলে বুদ্ধ অবশ্যই, অপ্রিয় সত্যকথা বলতেন। সে সময় তিনি ব্যক্তিকে 'মোঘপুরুষ' বা 'মূর্খ ব্যক্তি' বলে অভিহিত করতেন।

তরুণ, ব্রাহ্মণকুমার অম্বষ্ঠের সঙ্গে একটি ঘটনা। কোশলরাজ্যে বিচরণ করতে করতে ইচ্ছানঙ্গল নামক ব্রাহ্মণদের একটি বড়ো গ্রামে বুদ্ধ পৌঁছলেন। গ্রামটি কোশলরাজের তরফ থেকে মহাবিদ্বান ব্রাহ্মণ, পৌষ্করসাতি-কে অগ্রহার বৃত্তির জন্যে দেওয়া হয়েছিল। তথাগত বুদ্ধের গ্রামে আগমনের সংবাদ শুনে পৌষ্করসাতি নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র অম্বষ্ঠকে বুদ্ধের কাছে পাঠালেন। অম্বষ্ঠের মধ্যে ব্রাহ্মণ বংশের অহংকার পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। সে মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুদের অত্যন্ত তুচ্ছ চোখে দেখত। শাক্যদের সংঘে তার বড়ো কটু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই মনে মনে অম্বষ্ঠ ভীষণ ক্ষেপে ছিল। বুদ্ধের কাছে গিয়ে সামান্যতম শিষ্টাচারটুকু না দেখিয়েই পায়চারি করতে থাকা বুদ্ধের পাশে বসে পড়ে সে কথা বলতে শুরু করে দিল। এমন অশিষ্ট আচরণ দেখে বুদ্ধ একটু অবাক হলেন, তারপর চিরাচরিত প্রশান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—

"অম্বষ্ঠ, বৃদ্ধ আচার্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কি এইভাবেই কথা বলা হয়?"

অম্বষ্ঠ বলল—"না, কিন্তু, মুণ্ডক, শ্রমণ, শূদ্র ইত্যাদিদের সঙ্গে এইভাবেই কথা বলা উচিত—যেমন আপনার সঙ্গে।"

বুদ্ধ ততোধিক প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন—"অম্বষ্ঠ, তুমি গুরুর সন্নিকটে বাস করনি—বাস না করেই তুমি গুরুকুলবাসের অভিমানী হয়ে পড়েছ।"

অম্বষ্ঠের কথাটি চট করে মনে লেগে গেল। সে সমস্ত শিষ্টাচারের মাথা খেয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তথাগতের দিকে আঙুল তুলে বলল—

"ওহে গৌতম! শাক্যজাতি চণ্ডালদের জাতি। তারা ক্ষুদ্র, বৃথাই প্রলাপ বকে মরে। নিজেরা নীচ বলে তারা ব্রাহ্মণদের সম্মান করে না।"

ভগবান বুদ্ধের মুখে এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না। ধীর, শান্ত গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"শাক্যরা তোমার কী ক্ষতি করেছে যে তুমি এত কটুবাক্য শোনাচ্ছ তাঁদের?"

অম্বষ্ঠ বলল—"একবার আমি আচার্য পৌষ্করসাতির হয়ে কোনো একটি কাজে কপিলবস্তু গেছি। সংস্থাগারে (সংসদ ভবন) অনেক শাক্য এবং শাক্যকুমার উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই উচ্চ আসনে বসেছিলেন। আমার মনে হল, আমাকে দেখেই তাঁরা একে অন্যে হাসাহাসি, পরিহাস করতে শুরু করলেন। কেউ আমায় একটা আসনও এগিয়ে দিলেন না। শাক্যরা অত্যন্ত নীচ—তারা ব্রাহ্মণদের সম্মান করে না।"

বুদ্ধ বললেন—"দেখ অম্বষ্ঠ, সামান্য শালিখ পাখিও তার নিজের বাসায় পরিজনদের সঙ্গে কিচির-মিচির করে। স্বচ্ছন্দে লাফালাফি করে, উড়ে বেড়ায়। কপিলবস্তু শাক্যদের নিজেদের স্থান—সুতরাং এই ছোটো-তুচ্ছ ঘটনাটিকে নিয়ে তোমার এত উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়।"

অম্বষ্ঠ এত কথা শোনবার পাত্রই নয়। সে আবার রেগেমেগে একই কথা বলল। বুদ্ধ ভাবলেন—মূর্খকে স্তোকবাক্য শুনিয়ে লাভ নেই। তাই তিনি বললেন—"অম্বষ্ঠ, তোমার গোত্র কী?"

অম্বষ্ঠ বলল যে, সে কৃষ্ণায়ণ গোত্রজ।

বুদ্ধ বললেন—"অম্বষ্ঠ, নাম গোত্র অনুসারে শাক্যরা তোমার কাছে আর্যপুত্র হয় আর

তুমি শাক্যদের দাসীপুত্র।" এই বলে বুদ্ধ সেই প্রাচীন পরম্পরার কথা বললেন যাতে বলা হয়েছে, যে ইক্ষ্বাকু নিজের প্রিয়তমা রানির মন্ত্রণায় নিজের চারজন সন্তানকে বনবাসে পাঠালেন। হিমালয়ের কাছে এক শালবনে তারা সবাই গিয়ে উপস্থিত হল। এদেরই সন্তান শাক্যরূপে অভিহিত হল। ইক্ষ্বাকুর দিশা নামে এক দাসী ছিল যার থেকে একটি ছেলের জন্ম হয়—যার নাম কৃষ্ণ রাখা হয়। কৃষ্ণায়ণ গোত্রজ ব্রাহ্মণেরা এদেরই সন্তান। অম্বষ্ঠ নিজেই এই পরম্পরা সম্বন্ধে জানত— সে অস্বীকার করবে কী করে? এদিকে অম্বষ্ঠ দাসীপুত্রের গোত্রজ জেনে তার সঙ্গে আসা অন্যান্য ছাত্ররা হৈ হৈ করে টিটকারি দিতে আরম্ভ করল—"অম্বষ্ঠ দাসীপুত্র! অম্বষ্ঠ দাসীপুত্র!" বুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করে বললেন—"ছাত্রগণ! তোমরা অম্বষ্ঠকে দাসীপুত্র বলে পরিহাস করবে না। কৃষ্ণ মহান ঋষি ছিলেন। তাঁর অতুলনীয় বিদ্যা এবং তেজের সামনে ইক্ষ্বাকুকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল।"

বুদ্ধ অপ্রিয় সত্য বলতেন, কিন্তু কাউকে দুঃখ দেওয়ার জন্যে নয়। তিনি শান্তিপ্রিয়, শান্তিবাদী এবং শান্তি-আচারী ছিলেন। শাক্যকুলের সন্তান ছিলেন বুদ্ধ এবং কোলিয়রা তাঁর মাতৃকুলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুটি এলাকার মাঝে রোহিণী নদী প্রবাহিত। আজও নেপালের তরাই এবং গোরখপুরে প্রবাহিত নদীটির এই একই নাম। দুটি গণরাজ্য রোহিণীর জলে সেচ কার্য করত। জ্যৈষ্ঠ মাসে খেত-খাল শুকিয়ে যাওয়ায় দুটি রাজ্যের কৃষকরা একত্র হল। প্রত্যেকেই একই কথা বলতে লাগল। কোলিয়রা বলল—"যা জল আছে তাতে না তোমাদের, না আমাদের খেতের কাজ হবে। ভালো হয় যদি ভাগাভাগি না করে তোমরা আমাদের সম্পূর্ণ জল নিয়ে যেতে দাও। এতে আমাদের খেতের কাজ ভালোভাবে চলে যাবে।"

শাক্যরাও বলল, আমরা কিছুতেই ভাগ ছাড়ব না, এই করতে করতে দুই দলের মধ্যে ভয়ংকর ঝগড়া বেঁধে গেল। দুই রাজ্যই সৈন্যদল নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তথাগত বুদ্ধ যখন শুনলেন যে শাক্য এবং কোলিয়রা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি দুই দলের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন—"মহারাজগণ, এত কলহ কীসের?"

জানা গেল—জলের জন্য ঝগড়া। বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন—"জলের দাম কত?"

উত্তর এল—"কিছুই নয়।"

"আর ক্ষত্রিয়দের (প্রাণের) দাম কত?"—বুদ্ধের প্রতি প্রশ্ন।

"ভন্তে—সে তো অমূল্য।"

ভগবান মিষ্টি হেসে বললেন—"শুধু জলের জন্য অমূল্য ক্ষত্রিয়দের জীবন নষ্ট করছেন কেন?"—দু দলই মাথা নীচু করল। উদ্যত তলোয়ার পুনরায় কোষবদ্ধ হল। শান্তি আবার স্থাপিত হল।

রাজা প্রসেনজিতের ছেলে, যুবরাজ বিদূডভ শাক্যদের নাতি (পৌত্র-সম্পর্কিত) ছিলেন। বিদূডভের মা শাক্য রাজপরিবারের মেয়ে নন, তিনি দাসীপুত্রী ছিলেন। কেউ একদিন বিদূডভের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে 'দাসীপুত্র' বলে ঠাট্টা করে। যুবরাজ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে—তাঁর পিতার সঙ্গে ছল করে শাক্যরা নিজেদের কুলের কন্যা না দিয়ে একটি দাসীর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে। শুনে তাঁর রক্তে আগুন বইতে লাগল। তিনি মনে মনে ছক

কষতে লাগলেন কীভাবে শাক্যদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। তাদের উচ্ছেদ কীভাবে করা যায়, এই তাঁর দিন রাতের ধ্যান-জ্ঞান ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর বিদূড়ভ সিংহাসনে বসলেন। একদিন নিজের বিপুল সৈন্য নিয়ে তিনি শাক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বুদ্ধ যখন জানতে পারলেন বিদূড়ভের কথা তখন তিনি শাক্য এবং কোশলের সীমায় গিয়ে পৌঁছলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, রোদের প্রচণ্ড তেজ। সীমাপ্রান্তে কোশল দেশের দিকে মুখ করে থাকা একটা ঘন ছায়াযুক্ত বটগাছ ছিল এবং শাক্যদের দিকে একটি স্বল্প ছায়াযুক্ত বৃক্ষ। ভগবান সেই স্বল্প ছায়াযুক্ত বৃক্ষের নীচে গিয়ে বসলেন। বৃক্ষের ছায়া প্রখর রৌদ্রের তেজকে আটকাতে সক্ষম ছিল না। বিদূড়ভ তথাগতকে শ্রদ্ধা করতেন। শাক্য গণরাজ্যের সীমান্তে স্বয়ং বুদ্ধকে একটি স্বল্প ছায়াদায়ী বৃক্ষের তলায় বসে থাকতে দেখে তিনি এগিয়ে এসে বুদ্ধকে বন্দনা করে বললেন—

"ভন্তে, এই প্রচণ্ড গরমে এই স্বল্প ছায়াযুক্ত গাছটির নীচে কেন বসে রয়েছেন ? এদিকের এই ছায়াঘন বটবৃক্ষের নীচে বসে বিশ্রাম করুন।"

বুদ্ধের মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন—"ঠিক আছে মহারাজ। ছায়া অল্প হলই বা। বন্ধুদের ছায়া সবসময় ঠান্ডাই হয়ে থাকে।"

বিদূড়ভ বুদ্ধের কথার মর্মার্থ বুঝতে পারলেন। তিনি আস্তে আস্তে সৈন্যদলকে নিয়ে আপন রাজ্যে ফিরে গেলেন।

বুদ্ধ একজন স্বাধীন চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি চাইতেন অন্যেরা ভেড়ার পালের মতো তাঁর অনুসরণ না করে তারা নিজেরাই নিজেদের পথ ঠিক করুক। সেই কারণেই বুদ্ধ, দর্শন এবং আপ্ত বাক্যকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেননি। কেবল প্রত্যক্ষকেই বুদ্ধ প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। অনুমানকেও ঠিক ততটাই, যতটা সেটি প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর স্থাপিত। কোশল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি গভীর জঙ্গলের প্রান্তে কেশপুত্ত নামক একটি স্থান ছিল। কালামোরা সেখানে বসবাস করত। সার্থবাহরা সেখান দিয়েই গাড়ির সারি নিয়ে যাতায়াত করত। সাধুসন্তরাও এলাকাটিতে যেতেন। মহাত্মারা একে অন্যের বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়ে যেতেন। সবাই আপন আপন মতে জনসাধারণের চিত্তকে জোর করে টানতে চাইতেন। সবাই বিভ্রান্ত হত—কে সত্যি আর কে মিথ্যে—বোঝা কঠিন ছিল।

পরিব্রাজন করতে করতে বুদ্ধও একসময় কেশপুত্তে গিয়ে পৌঁছলেন। কালামোরা নিজেদের বিভ্রান্তিকে বুদ্ধের সামনে প্রকট করল। বুদ্ধ বললেন—কালামোগণ তোমাদের বিভ্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমার কথা শোন—"কোনো কথাকেই তোমরা আপ্তবাক্য বলে মাথায় তুলে নিও না। শ্রুতি বা পরম্পরায় তার প্রচলনই থাক, শাস্ত্রের অনুকূলও যদি সেটি হয়, বা অন্য যে কোনো কারণই হোক—তাকে এককথায় মেনে নেবে না। অভ্যস্ত জীবনধারার সঙ্গে খাপ খেলেই বা গুরুজনের মুখনিঃসৃত বলেই যে সেটি পরম সমাদৃত বস্তু হবে, এমন কোনো কথা নেই। মনেপ্রাণে যুক্তি দিয়ে বিচার করে যখন বুঝবে যে উপদেশটি সত্যিই হিতকারী—তখনই মনেপ্রাণে সেটি গ্রহণ করবে।"

বুদ্ধ প্রকৃতির অনন্য প্রেমিক ছিলেন। শহরেও তিনি কোনো ছায়াঘন বাগিচায় আশ্রয় নিতেন। যদি বৈশালীর মতো পাশেই কোনো মহাবন থাকত, তখন সেখানেই উঠতেন। যাবতীয়

বস্তুকে অনিত্য বলছেন মানে তার এই অর্থ নয় যে তাদের কোনো মূল্য নেই। অনিত্যের দ্বারা বুদ্ধ বস্তুর বাস্তবিক সত্যটাকে প্রকাশ করতে চাইতেন। সৌন্দর্য তো সেই বস্তুতেই থাকে যা নিত্য পরিবর্তিত হতে থাকে।

যাবতীয় বস্তুকেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখতে চেষ্টা করতেন। কোনো ভিক্ষুকে কর্তব্যে অবহেলা করতে দেখলে তিনি বলতেন—'মোঘং স রট্‌ঠপিণ্ডং ভুঞ্জতি' (মূর্খটা ব্যর্থই দেশের অন্ন ধ্বংস করছে)। যে কোনো ব্যবহারকে তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতে জনতার হিতাহিতের দৃষ্টিতে দেখতেন।

সুস্‌মারগিরিতে (আজকের চুনার পাহাড়ে) বৎসরাজ উদয়নের ছেলে যুবরাজ বোধিকুমার থাকতেন। তিনি ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেন এবং নবনির্মিত রাজপ্রাসাদে বহু অর্থব্যয় করে মহার্ঘ বস্ত্র দিয়ে বুদ্ধের উপবেশনের ব্যবস্থা করলেন। বুদ্ধ সেই পর্যন্ত এসে থমকে গেলেন। বোধিকুমার করজোড়ে বললেন—"ভগবান, এর উপর দিয়ে এসে দয়া করে আমার নির্মিত দ্রব্যগুলিকে কৃতার্থ করুন।" ভগবান সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আনন্দ বললেন—"রাজকুমার, ভগবানের জন্যে বিশেষভাবে পেতে দেওয়া বহুমূল্য বস্ত্রাদি সরিয়ে নিন। উনি এর ওপর দিয়ে যাবেন না। তথাগত জনতার কথা ভাবছেন। সবার জন্যে যা ব্যবস্থা, ভগবানের জন্যেও তাই হবে।"

বুদ্ধ কোনোদিন চাইতেন না, লোকেরা নিজেদের ঐশ্বর্যের প্রদর্শন করুক। এমন রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত হোক, যার জন্যে অন্যান্যদের কষ্ট হয়।

জনকল্যাণের ইচ্ছার আরেকটি উদাহরণ। বুদ্ধের উপদেশকে প্রত্যেক জনগোষ্ঠী নিজ নিজ ভাষায় বলাবলি করত। কোশলের জনগণ কোশলী (পালি)-তে মগধের জনগণ মাগধীতে, অবন্তীর অধিবাসীরা অবন্তী-তে, কুরুরা কৌরবী-তে। সে কারণেই ভাষাগত ঐক্য কোথাও ছিল না। সে সময়ের দুজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ছিলেন। তাঁরা এই বৈচিত্র্যকে সরিয়ে ঐক্য আনার জন্য বুদ্ধকে প্রস্তাব দিলেন যে এই সুবিশাল ভিক্ষুসংঘে, নানা নাম, গোত্র, কুল, জাতির ভিক্ষুরা নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় বুদ্ধ বচনের ব্যবহার করে তাকে দূষিত করে থাকে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি বুদ্ধের বচনকে আমরা ছন্দে বেঁধে দিই।

বুদ্ধ এককথায় প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়ে বললেন—"ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ বচনকে কখনও ছন্দে বেঁধো না। জনসাধারণ তাদের নিজের ভাষায় বুদ্ধ বচনের শিক্ষা পাক।"

তিনি জানতেন যে, ছন্দে (বেদ এবং ব্রাহ্মণদের ভাষায়) বেঁধে দিলে বুদ্ধ বচনকে কিছু মুষ্টিমেয় লোকই জানতে পারবে, কিন্তু আপন আপন ভাষায় বুদ্ধ-বচন পড়ার ফলে এটাই হয়েছে যখন বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম গেছে, সেখানে খুব তৎপরতার সঙ্গে তা অনূদিত করা হয়েছে।

বুদ্ধ অতিভোগ বা অতিমাত্রায় ত্যাগেরও বিরোধী ছিলেন। তপস্যার দ্বারা শরীরকে কৃষকায় করার তিনি বিরোধী ছিলেন। কর্মকাণ্ড, ভক্তি ইত্যাদির থেকে বুদ্ধের বেশি প্রবণতা জ্ঞান ও বুদ্ধির দিকে ছিল। তাই বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান, শ্রেষ্ঠী, রাজা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই যুগের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি কীভাবে অপরাজিত থাকতে পারে—এ ব্যাপারে বুদ্ধ সাতটি উপদেশ দিয়েছিলেন :

১. সবসময় একজোট হয়ে সামূহিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
২. সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজোট হয়ে কাজ করা।
৩. আইনকে মেনে চলা।
৪. বয়োজ্যেষ্ঠদের যথাযথ সম্মান করা।
৫. নারীদের উপর অত্যাচার না করা।
৬. জাতীয় ধর্ম পালন করা এবং
৭. ধর্মাচার্যদের আদর-আপ্যায়ন করা।

বুদ্ধের দর্শন ক্ষণিকবাদী, যে কোনো বস্তুকে সে এক ক্ষণ থেকে বেশি স্থায়ী বলে মনে করে না। কিন্তু সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিতে বুদ্ধ এই ক্ষণবাদের নিয়ম প্রয়োগ করতে চাননি। ধনবান শাসক-শোষক সমাজের সঙ্গে এই পারস্পরিক ভাববিনিময় করে নেওয়ার জন্য বুদ্ধের ন্যায় বিশেষ প্রতিভাবান দার্শনিকের সামাজিক স্বীকৃতি খুবই সহজ ছিল। কুটদন্ত, সৌনদণ্ডের ন্যায় ধনী ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। রাজারা বুদ্ধের সেবার জন্য সবসময় তৎপর থাকতেন। সেই সময় ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীবর্গের টাকার থলি বুদ্ধের মহান কর্ম উদ্‌যাপনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য দানবীর সদূত্তের (অনাথপিণ্ডক) বুদ্ধের জন্য জেতবন ক্রয় করার কথা তো সবার জানা।

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র কৌশাম্বীর তিনজন প্রধান শ্রেষ্ঠী মঠ তৈরি করে জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বলতে গেলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে, রাজাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠীরা, ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি সাহায্য করেছিল।

সামাজিক স্থিতি—বুদ্ধের সময়ে সমাজে দাস, মজুরেরা সংখ্যায় অনেক ছিল। রাজা, শেঠ এবং পুরোহিতরা তাদের মাথায় চড়ে মৌজ করতেন। বেদ ও উপনিষদ এর বিরুদ্ধে ছিল না। গরিবরা নিজেদের দারিদ্র্যকে ভগবানের দান বলে মেনে নিত। এই লুটপাট বজায় রাখার জন্যে স্বার্থান্ধরা ব্রহ্মবাদ এবং পুনর্জন্মের প্রচার করেছেন।

উপরোক্ত মতের থেকে বুদ্ধের ক্ষণিকবাদ বৈপ্লবিক ছিল। সংসার, সমাজ, মানুষকে এই মত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত বলে মানত। বুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে নদী পার হওয়ার ভেলারূপে স্বীকার করেছেন—সেগুলিকে আজীবন মাথায় বয়ে বেড়ানো তাঁর একান্তই অপছন্দ ছিল। তবুও কর্মের সিদ্ধান্তকে আরও মজবুত করার জন্য বুদ্ধ অন্যরূপে, অন্যভাবে পরলোক এবং পুনর্জন্মকে স্বীকার করেছেন। সমাজে আর্থিক বৈষম্য বজায় রেখে বুদ্ধ বর্ণ ব্যবস্থা, জাতিগত প্রভেদ ইত্যাদি উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। এতে আর্থিক বৈষম্য দূর তো হয়ইনি, কিন্তু গরিব আমজনতা বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

দারিদ্র্য এবং দাসত্বকে উচ্ছেদ করবার প্রচেষ্টা বা কর্মসূচি বুদ্ধ তৈরি করেননি। এটা ঠিক যে দারিদ্র্য এবং দাসত্বের কঠোরতাকে কিছু কম করার দিকে বৌদ্ধ ধর্ম সচেষ্ট হয়েছিল। সে যুগে ধার শোধ দিতে না পারলে মহাজন ধার নেওয়া ব্যক্তিটিকে কিনে নিত। এর থেকে বাঁচবার জন্যে বহু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ভিক্ষু হয়ে যেত। কিন্তু এতে মহাজনদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত। তাই বুদ্ধ বললেন—"ঋণীকে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) দেওয়া যাবে না" (মহাবগ্গ ১/৩/৪/৮)। একইভাবে দাসরাও ভিক্ষু হয়ে গেলে মালিকদের চরম অসুবিধা হত। তাই তিনি দাসদেরও

সন্ন্যাসের রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। (ওই ১/৩/৪/৮) পরবর্তীতে যখন মগধের রাজা, বুদ্ধের অনন্য ভক্ত বিম্বিসারের সৈনিকেরা যুদ্ধে না গিয়ে ভিক্ষু হতে লাগল— তখন বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ-- "সৈনিকেরাও প্রব্রজ্যা পাবে না/ দেওয়া যাবে না।" নিয়মটি চালু করেন।

বুদ্ধের এই দুর্বল দিকগুলি থাকলেও, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং সর্বোপরি দর্শনে বুদ্ধের সিদ্ধান্ত অসাধারণ উন্নতি এনেছে। বৌদ্ধ ধর্মের চিহ্ন আজ থেকে বহু শতাব্দী আগে ভারতের বুক থেকে মুছে গেছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম চিন, জাপান, কোরিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে ও মহাদ্বীপে ছড়িয়ে গেছে এবং নবজাগরণ এনেছে। এরই দ্বারা সেই দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। গত শতবর্ষে আমরা বুদ্ধের নামের দ্বারা পরিচিত হতে আরম্ভ করি। আজ তাঁর নাম, তাঁর কর্ম জনতার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বুদ্ধ প্রচারিত শান্তির বাণী দুনিয়ায় আবার জোরদার হচ্ছে।

# বুদ্ধ-কালীন নাটক

বুদ্ধের সময়কালে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পশচম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে নাটক অর্থে যা ভাবা হত, তার সঙ্গে এখনকার নাটকের কোনো মিল নেই। কিন্তু জীবনের ঘটনার অনুকরণ যেভাবে ছোটো বাচ্চারা করছে বা করে থাকে, সেটা শৈশব অবস্থায় থাকা মানুষের মধ্যে সম্ভব। সে যুগে পরদা ছিল না। বেশ-ভূষা, সাজ-সজ্জাতেও সূক্ষ্ম অনুকরণ করা হত না, তবে লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য নাটক বলে কিছু অবশ্যই ছিল। অশ্বঘোষ থেকে শুরু করে সমস্ত হিন্দু-কালে, আমাদের এখানে নাটক লেখা হত। সেখানে কিছুটা পড়ারও কাজ ছিল, কিন্তু, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস যে নাটকগুলি লিখেছেন, সেগুলি পড়বার জন্য নয়—মঞ্চের উপর প্রয়োগ, অর্থাৎ অভিনয়ের জন্য। প্রাকৃত যুগে (১-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ) সংস্কৃত তৎসম থেকে তদভবে রূপান্তরিত হওয়ায় দার্শনিক তত্ত্বগুলি বোঝা সহজ ছিল। সে কারণেই সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত নাটকগুলিকে বোঝা, সে যুগের শিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল। প্রাকৃত যুগের পরে লিখিত নাটকের অভিনয়ে, খুব অল্প সংখক লোকই অনন্দ পেত। সে কারণেই, এ যুগের নাটক, বেশিরভাগই অভিনয়ের জন্য নয়, কবিতার মতো পড়বার জন্য লেখা হয়েছে মনে হয়।

পরবর্তী কালে পালি সাহিত্যে লেখা বা অভিনীত নাটকের খুব একটা রেওয়াজ না থাকলেও অভিনয় এবং তামাশার ব্যবস্থা ছিল, যেগুলিকে পালিতে 'সমজ্জা' বলে অভিহিত করা হত। সেযুগে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল মগধের রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহে খুব বড়ো মাপের সমজ্জা (অভিনয় এবং রং-তামাশা) আয়োজিত করা হত, যাকে 'গিরগ্গ সমজ্জা' বলা হত। বোধ হয় গিরির (পাহাড়ের) সামনে বা সানুদেশে আয়োজিত করা হত তাই এমন নাম। বুদ্ধের সময়ে, পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলে প্রাচীন রাজগৃহ শহরের অবস্থিতি ছিল। কাঠের বাড়িঘর হওয়ার দরুন কখনও কখনও বিধ্বংসী আগুন লেগে গেলে শহরের অনেকটা ভাগই জ্বলে নষ্ট হয়ে যেত। পরবর্তীকালে নিয়ম করা হল যে, যাঁর বাড়িতে প্রথমে আগুন লাগবে. তাঁকে পাহাড়ের বাইরে গিয়ে বাস করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজমহলেই প্রথমে আগুন লেগে যায়, তাই নিয়মানুসারে অজাতশত্রুকে বাইরে প্রাসাদ নির্মাণ করতে হল। রাজা বাইরে চলে আসায় নতুন রাজধানী সেখানেই স্থাপিত হল। অজাতশত্রুর সময়কালেই রাজগৃহ নবনির্মিত হয়ে গিয়েছিল। অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারীরা রাজধানী পাহাড় থেকে সরিয়ে গঙ্গাতীরে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করায়, প্রাচীন রাজধানী সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল।

খ্রিঃ পূঃ ৪৯৩ -এর আগে বিম্বিসারের সময়কালে গিরগ্গ সমজ্জা বড়োভাবে আয়োজিত করা হত। খোলা স্থানে লোকেরা দল বেঁধে অভিনয় দেখবার জন্য জমায়েত হত। দূর থেকে যাতে দেখবার সুবিধা হয় তার জন্যে সাধারণ লোকরা বসার জন্য মাচা বানাত। মন্ত্রী এবং রাজপুরুষদের জন্য মাচায় আসন পেতে রাখা হত। গদি বা আসন—পশম, লতা, ছাল, ঘাস-পাতা দিয়ে সুদৃশ্যভাবে তৈরি করার রীতি ছিল, নাটক ইত্যাদি শেষ হলে, সাজসজ্জাগুলি খুলে

নেওয়া হত। সমজ্জার স্থানে প্রচুর পশম, লতা, গাছের ছাল, ঘাস এবং গদির অংশবিশেষ পড়ে থাকতে দেখা যেত। কেউই এই অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ব্যবহার করত না। এগুলির উপযোগিতার ব্যাপারে ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—"আমি অনুমতি দিলাম—পশম, গাছের ছাল, ঘাস আর পাতা এই পাঁচটি দ্বারা নির্মিত গদি বা আসনকে পুনরায় সেলাই করা যেতে পারে।" (হিন্দি বিনয়পিটক থেকে, পৃষ্ঠা ৪৫৫)

বিনয় পিটক থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে 'গিরগ্গ সমজ্জা'-তে নাচ, গান, বাজনা সবই হত।

রাজগৃহে যে নাচ, গান, তামাশা ইত্যাদি আয়োজিত করা হত তার জন্যে মেলার ন্যায় খুব বড়ো আয়োজন করে দর্শকদের জন্যে উঁচু স্থান বা বসবার আসন বানানোটা কোনো সমস্যা ছিল না।

ভোজপুরের গ্রামে জনপ্রিয় লোকনাট্যকার ভিখারি ঠাকুরের অভিনয় দেখার জন্য কুড়ি পঁচিশ হাজার দর্শক জমায়েত হত বটে, কিন্তু ভালোভাবে নাটক দেখতে না পওয়ায় প্রায়ই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ঘটত। নাটক যথাযথভাবে উপভোগ করার জন্য দর্শক এবং আসন সংখ্যা সীমিত থাকা দরকার। হয়তো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আলাদা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। তবে, এর হদিশ আমরা পালি সাহিত্যে পাই না।

নৃত্যও এক ধরনের অভিনয়। এতে বিভিন্ন প্রকারের ভাব সংকেত দেওয়া থাকে। সর্পনৃত্য, সিংহনৃত্য, ইত্যাদি বহু প্রকারের নৃত্যের মাধ্যমে ভাবগত, ভঙ্গিমাগত প্রকাশ শিল্পীরা করে থাকে। এটাও এক ধরনের অনুকরণ, যা আমরা অভিনয়ে পাই, গ্রিকদের দ্বারা আমাদের নাট্যচর্চা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তবে এমন নয় যে, আমাদের দেশে প্রাচীনকালে নাট্যচর্চা ছিল না। ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে—'গীত-নচ্চ-বাদিত-বিসূকদস্সন' এই যাবতীয় বস্তুগুলি বর্জিত বলা হয়েছে। গীত, নৃত্য, বাদ্য ছাড়া 'বিসূকদস্সন' মানে নাটককেই অভিহিত করা হয়েছে।

বহু লোক একসঙ্গে যাতে দেখতে পায়, তাই মাচা বেঁধে সবাই মিলে দেখার চেষ্টা করা হত— অথবা পাহাড়ের গা কেটে দর্শকদের বসার স্থান করা হত। মেলায় আজও যেমন দেখা যায় — আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কুরুচিপূর্ণ মনোরঞ্জন, মদ্যপান, জুয়াখেলা বা মারপিট— প্রাচীন যুগেও বহু লোকসমাগম হলে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলি ঘটেই যেত। তাই আমরা দেখি বুদ্ধের নির্বাণের সোয়া দুশো বছর পরে সম্রাট অশোক এ ধরনের নাচ-গান-অভিনয়ের মধ্যে বহুপ্রকারের দোষ জড়িত দেখে এগুলির আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

## অবন্তীতে ধর্ম-প্রচার

বৌদ্ধ ধর্মের আরম্ভ কাশী, কোসল, মগধ, মল্ল, বজ্জি, বিদেহ ইত্যাদি জনপদগুলিতে হয়েছিল। এই সমস্ত অঞ্চলগুলি পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের এলাকাভুক্ত। কিন্তু ধর্মটির প্রচার-প্রসারে অবন্তী-রাজ্যের একটি বড়ো ভূমিকা ছিল। আজ যে স্থানটিকে আমরা মালব বলে জানি, সেটিই প্রাচীনকালে অবন্তী নামে পরিচিত ছিল। চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসা লোকেরা যখন অবন্তী দখল করে নেয় তখন তার নাম বালম হয়ে যায়। অবন্তীবাসীরা শুধু বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসারে ভূমিকা নেননি, উপরন্তু তাঁদের ভাষা, পালির উপরেও যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

পালি মূলত মাগধী ভাষা। পালি পংক্তি বা সারিকে বলা হয়ে থাকে। বুদ্ধের মুখনিঃসৃত পালি (পংক্তিবদ্ধ শব্দাবলির) বস্তুটির জন্যেই আগে 'পালি' শব্দের প্রয়োগ করা হত। ইউরোপীয় বিদ্বানরা এই ভাষাটিকে একটি নাম দিতে চাইছিলেন। তাই তাঁরা ভাষাটিকে পালি ভাষা বলে অভিহিত করেন। এখন স্থবিরবাদের অন্তর্গত ত্রিপিটক, অট্‌ঠকথা (ভাষা) এবং অন্যান্য গ্রন্থের ভাষাকেই কেবল পালি বলা হয় না, উপরন্তু অশোক এবং তাঁর পরবর্তী যে ভাষা-রূপ যেগুলি প্রাকৃতের পূর্ব পর্যন্ত চলে এসেছে, সেই যাবতীয় ভাষাগুলি পালিতে সম্মিলিত করা হয়ে থাকে। পালি ভাষার একটা ব্যাপক কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে। খ্রিস্ট জন্মের পূর্বে পাঁচশো বছরের মধ্যে উত্তর ভারতের যাবতীয় ভাষাগুলির সম্মিলিত নাম পালি বলা যেতে পারে। এতে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক প্রভেদ অবশ্যই ছিল, যেটা আশোকের শিলালিপিগুলি পড়লে বোঝা যায়। অবন্তীরও নিজস্ব একটি ভাষা ছিল, যার বিকশিত রূপ আজকালকার মালবী ভাষা। দশার্ণ এবং অবন্তীর ভাষার মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল, বলা কঠিন। শতাব্দী ধরে একটি ভাষা বিকশিত হতে থাকায় সেটি একটি প্রদেশ থেকে অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। দশার্ণ, অবন্তীর প্রতিবেশী হওয়ার দরুন, দুটি ভাষার মধ্যে যদি বা নৈকট্য থেকেও থাকে তবুও এটাই মানতে হবে যে, দশার্ণের ভাষাকে পাঞ্চালী আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

পাঞ্চাল উপনিষদ যুগে এবং বুদ্ধের সময়কালেও একটি বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। জনপদটি বর্তমান রোহিলখন্ড কমিশনারি এবং আগরা কমিশনারি-র অনেকটা ভাগ অর্থাৎ হিমালয়ের তরাই থেকে দক্ষিণে যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত। হতে পারে, এটা আশপাশের আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও নিজের আওতাভুক্ত করে নিয়েছিল। এবং সেজন্যেই আজকের বুন্দেলী, ব্রজ, কনৌজী এবং রুহেলী ভাষাগুলি পাঞ্চলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। অশোকের সময় মাগধী ভাষা এবং সংস্কৃতির দেশব্যাপী আধিপত্য ছিল। কুশানদের সময়ে তাদের রাজধানী মথুরা হওয়ায় সেখানকার (সূরাসেন অঞ্চলের) ভাষা শৌরসেনী তিনশো বছর ধরে আধিপত্য রেখেছে। কনৌজী (পাঞ্চালী) এবং শৌরসেনী ভাষার প্রাকৃত যুগে তেমনই সম্পর্ক ছিল যেমনটা আজকাল কনৌজী আর ব্রজভাষার। এদের দুটিতে ফারাক খুবই কম। সেদিক দিয়ে, রুহেলী, কনৌজী, ব্রজভাষা এবং বুন্দেলী-কে আমরা একই ভাষা বলতে পারি। এটাকে এককালে

মধ্যদেশীয় বলা হত। পরে সেটিকেই গোয়ালিয়রী বলে অভিহিত করা হল, আবার সূরদাসের কৃষ্ণ কাব্যের অসামান্য প্রভাবের জন্য তাকে ব্রজভাষা বলা হতে থাকে।

প্রাচীন অবন্তী ভাষা এবং তার আঞ্চলিক অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মে নিজেদের কাজের জন্য একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। পালি-ত্রিপিটকের ভাষাকে মাগধী বলতে বিদ্বানদের আপত্তি রয়েছে, তার কারণ মাগধীতে 'র'-এর স্থানে 'ল' দেওয়ার নিয়ম এবং 'স' বর্জন করে 'শ' ব্যবহার করার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য পাঞ্চলী, শৌরসেনী ইত্যাদি মধ্যদেশীয় ভাষাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। এর পরিধি গুজরাত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। তাই মনে হয়, মাগধীয় বৈশিষ্ট্য অপসারিত করতে অবন্তীর বেশ বড়ো ভূমিকা ছিল। অশোকের সময় মহেন্দ্র এবং তার সাথীরা সিংহলে ধর্ম প্রচার করতে যায়। মহেন্দ্রের মামারবাড়ি বিদিশা হলেও, সে মগধেরই সন্তান ছিল। সিংহলে দুই আড়াইশো বছর পর্যন্ত ত্রিপিটক মৌখিক ছিল। যতদিন না সেটা লিপিবদ্ধ হয়, ততদিন ভাষাগত স্তরে পরিবর্তন অবশ্যই সংঘটিত হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা মৌখিক ভাষাকে কণ্ঠস্থ করেছিল, পরিবর্তনটা তাদের দিক থেকেই এসেছিল বলে মনে হয়। সিংহলের অধিকাংশ লোক গুজরাত থেকেই গিয়েছিল। গুজরাত এবং অবন্তী'র ভাষায় বেশ মিল রয়েছে। এই মিলের পিছনে অবন্তীর অধিবাসীদের গুজরাতে বসবাস একটি প্রধান কারণ। ত্রিপিটকের ভাষা বর্তমান রূপে আসার পিছনেও অবন্তীর প্রভাব ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের অশোককালীন প্রচারকদের মধ্যে সবাই অবন্তী দশার্ণেরই ছিল এমনটা বলা যায় না। অশোকের গুরু মোগ্গলীপুত্ত তিস্সা-র নাম আমরা প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে জানতাম, কিন্তু তাঁর অস্থি সাঁচিতে পাওয়া গেছে। এভাবে সে সময়ের অন্যান্য ধর্ম প্রচারকদের অস্থিকেও সম্মানপূর্বক সেখানে রাখা হয়েছিল। এর থেকে বলা যেতে পারে যে মালব ভূমি বৌদ্ধদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

বুদ্ধের সময় অবন্তীর বেশ নামডাক ছিল। বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্ত, মৌদগল্যায়ন, মহাকাশ্যপ এবং মহাকাত্যায়ন প্রমুখ চার জন ছিলেন। কাত্যায়ন উজ্জয়নীতে জন্মে ছিলেন। তিনি অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের পুরোহিতের পুত্র এবং স্বয়ং রাজপুরোহিত ছিলেন। তাঁর বিষয়ে অঙ্গুত্তরনিকায় অট্ঠকথা থেকে আমরা নিম্নলিখিত কথাগুলি জানতে পারি।—

মহাকাত্যায়ন উজ্জয়িনী নগরে পুরোহিতের ঘরে জন্মেছিলেন। বড়ো হয়ে তিনি বেদে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং পিতার দেহত্যাগের পর তাঁর পদে অভিষিক্ত হন। একদিন রাজা চণ্ডপ্রদ্যোত আপন অমাত্যদের একত্র করে বললেন—"পৃথিবীতে বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছেন, যে যোগ্য ব্যক্তি তাঁকে গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, সে নিয়ে আসুক।"

অমাত্যগণ একবাক্যে উত্তর দিলেন — "মহারাজ, পরমপণ্ডিত আচার্য কাত্যায়নই এই কাজে সমর্থ, আপনি তাঁকেই প্রেরণ করুন।"

রাজা কাত্যায়নকে ডেকে বললেন—"হে আচার্য! আমি অনুরোধ করছি আপনাকে তথাগতের কাছে যেতে। তাঁকে নিয়ে আসতে।"

কাত্যায়ন গম্ভীর স্বরে কললেন—"মহারাজ, যদি প্রব্রজিত হবার অনুমতি পাই তাহলে যেতে পারি।"

মহারাজ বললেন—"হে আচার্য ! যেভাবেই হোক বুদ্ধকে নিয়ে আসুন"।

তিনি ভাবলেন—"বুদ্ধের কাছে যাওয়ার জন্যে খুব বেশি লোকের প্রয়োজন নেই। তাই সাতজন এবং নিজে অষ্টম জন রূপে—তাঁরা ভগবানের কাছে গেলেন। তখন বুদ্ধ তাঁদের ধর্মোপদেশ দিলেন। উপদেশ পাবার পর তাঁরা সবাই অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হলেন। বুদ্ধ সস্নেহে তাঁদের 'এসো'— বলে দুহাত মেলে ধরলেন। বলা হয়, অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হবার দরুন এবং ঋদ্ধি-সিদ্ধিধারী পাত্র ও চীবর ধারণ করার জন্যে তাঁদের শরীর থেকে শ্মশ্রু-গুম্ফ লোপ পেয়ে গেল এবং শতবর্ষপ্রাপ্ত স্থবিরের ন্যায় তাঁদের চেহারা (স্তান) বৃদ্ধি হয়েছে দেখতে লাগল। নিজের প্রধান কাজ শেষ হবার পর স্থবির কাত্যায়ন বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন— উজ্জয়িনীতে যাত্রা করবার। তথাগত ধীর কণ্ঠে কাত্যায়নকে বললেন—"বুদ্ধ কোনো একটি কারণের জন্য যাওয়ার অযোগ্য স্থানে গমন করেন না।" তিনি স্থবিরকে বললেন— "ভিক্ষু, তুমিই যাও। তুমি গেলেও রাজা প্রসন্ন হবেন।"

মহাকাত্যায়ন, বুদ্ধের বন্দনা করে সাতজন ভিক্ষুসমভিব্যাহারে উজ্জয়িনীর দিকে এগিয়ে চললেন। পথে তৈলপ্রণালী নামে একটা লোকালয় পাওয়া গেল। যেখানে একটি অতি-সুলক্ষণা কন্যাকে দেখতে পেয়ে, তাঁকে কাত্যায়ন নিয়ে চললেন। পরবর্তীকালে এই মেয়েটিই চণ্ডপ্রদ্যোতের পাটরানি এবং যুবরাজের মাতা রূপে বহুল পরিচিতা হয়ে ওঠে।

রাজার কাছে খবর গেল— আর্যপুরোহিত কাত্যায়ন প্রব্রজিত হয়ে ফিরে এসেছেন। মহারাজ আনন্দিত হয়ে উদ্যানে গিয়ে ভোজনপর্ব সমাধা করার পর স্থবিরদের ডেকে পাঠালেন। বিশেষভাবে তাঁদের বন্দনা করে—একপাশে বসে রাজা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভন্তে, ভগবান বুদ্ধকে দেখছি না! তিনি কোথায়?"

কাত্যায়ন শান্তগলায় উত্তর দিলেন—"মহারাজ, ভগবান নিজে না এসে, আমায় পাঠিয়েছেন।"

মহারাজ এতে রেগে যাবেন বলে কাত্যায়ন ভেবেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের বাক্য ব্যর্থ হল না। বুদ্ধ না এলেও তাঁর শিষ্যত্ব প্রাপ্ত স্থবির কাত্যায়নকে পেয়ে বুদ্ধের না আসাটা মহারাজের কাছে পীড়াদায়ক বলে মনে হল না। তিনি হাসিমুখে বেশ, বেশ বলে চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—"ভন্তে, আজ ভিক্ষা কোথায় পেলেন?"

ভিক্ষা হয়নি শুনে স্থবিরদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ভোজনের যাবতীয় সামগ্রী ভিক্ষুদের সেবায় প্রেরণ করার আদেশ দিলেন মহারাজ। যে মেয়েটিকে স্থবিররা নিয়ে এসেছিলেন— কাত্যায়নের অনুরোধে মহারাজ তাকে পাটরানি বা রাজমহিষী পদে অভিষিক্ত করলেন। এই মহারানির গর্ভে কালক্রমে সন্তান আসে এবং একটি পুত্র প্রসব হয়। শিশুটির নাম গোপালকুমার রাখা হয়। সেই পুত্রের জন্য গোপালের মা দেবী নামে প্রসিদ্ধ হলেন। মহারানি স্থবিরের উপর বিশেষ তুষ্টা হন। এর ফলে রাজাকে বলে কাঞ্চন বন-উদ্যান-স্থলে স্থবিরের জন্যে তিনি কাঞ্চন বিহার নির্মাণ করেন।

উজ্জয়িনীতে রাজকীয় কাঞ্চন বন, কাঞ্চন বিহার রূপে পরিচিত হল। বন সেইস্থানেই ছিল যেখানে শহরের বাইরে এখনও উজ্জয়িনীর সর্বোচ্চ স্তূপের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

কাত্যায়নের সময় অবন্তী ও দক্ষিণাপথে ভিক্ষুরা সংখ্যায় বেশ কম ছিলেন। ভিক্ষুপদে বৃত্ত করা বা সংঘের কর্মপদ্ধতির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে অন্ততপক্ষে দশজন ভিক্ষুর প্রয়োজন ছিল। কুররঘর অবন্তী রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল। সেই লোকালয়ের নিবাসী, এক তরুণ , কাত্যায়নের কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিল। ছেলেটির ভিক্ষু হওয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভিক্ষুদের সংখ্যা দশজন না হলে এটা হওয়া সম্ভব ছিল না। কুটিকণ্ণ নামক সেই তরুণটির অবশেষে কোনোমতে দীক্ষা হল। কাত্যায়নের মনে এ ব্যাপারে বেশ খটকা লাগল যে দশজনের সংখ্যা পূর্ণ না হলে কোনো নতুন ব্যক্তিকে উপসম্পদা বা দীক্ষা প্রদান করা যাবে না— এ নিয়মটা খুব একটা সঠিক নয়। তিনি তাঁর শিষ্য কুটিকণ্ণ বা কুটিকর্ণকে বুদ্ধের দর্শন করতে পাঠালেন। কুটিকর্ণ ভগবানের দর্শন করতে খুবই উৎসাহী ছিল। বুদ্ধের দর্শনে যাওয়ার আগে কাত্যায়ন শিষ্যকে বুদ্ধের কাছে বেশ কিছু জরুরি কথা বলবার উপদেশও দিয়ে দিলেন। বিনয় পিটকে এর উল্লেখ আছে—

কাত্যায়ন তাঁর যোগ্য শিষ্যকে আশীর্বাদ করে বললেন— "বৎস, এটি অতি উত্তম যে, ভগবানের চরণ দর্শনে যাচ্ছ —নির্ভয়ে যাও। গিয়ে বলো— আমার উপাধ্যায় ভগবানের চরণে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়েছেন।" বলতে বলতে কাত্যায়নের সমস্ত দেহ আবেগে কেঁপে উঠল। আবেগ সংবরণ করে তিনি বললেন—"আর একটা কথা। ভগবানকে এখানকার কথা জানাবে। তাঁকে বলবে— ভন্তে, অবন্তী-দক্ষিণাপথে খুব কম ভিক্ষু রয়েছেন । তিন বছর কাটিয়ে বহু কষ্টে সংঘে দশজন ভিক্ষু দীক্ষিত হওয়ার পর — তারপর আমার ঠাঁই হয়েছে। । বড়ো ভালো হয় যদি তিনি অবন্তী-দক্ষিণাপথে ছোটোখাটো সংঘের মধ্যেই উপসম্পদার জন্য অনুমতি দেন। ভগবানকে বলবে বৎস, যে আমাদের এখানকার মাটি অনুর্বর, জমি নিষ্ফলা, কাঁটায় পথ চলা দায়। এদিককার লোকেরা স্নান করতে ভালোবাসে, অনুগ্রহ করে তিনি যেন নিত্য স্নানের আজ্ঞা দেন। এদিকে ভেড়া এবং ছাগলের চামড়া পেতে বসার নিয়ম। বলবে—হে ভন্তে, দয়া করে চর্মময় আস্তরণের ব্যবহার করবার অনুমতি দিন। ভগবানকে এই ব্যবহারিক সমস্যাগুলি নিবেদন করবে, বুঝেছ।"

কুটিকর্ণ সব শুনে— মাথা নুইয়ে 'যথা আজ্ঞা' বলে ধীর পদে শ্রাবস্তীর দিকে প্রস্থান করল— যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন।

বুদ্ধকে দর্শন করে কুটিকর্ণ অভিভূত হল। প্রণাম জানিয়ে একে একে কাত্যায়নের বলে দেওয়া সমস্যাগুলি ভগবানের কাছে জানাতে লাগল সে।

বুদ্ধ স্তব্ধভাবে বসে সব শুনলেন। তারপর উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের কাছে ধর্মপ্রচারের এক নতুন নিয়ম তুলে ধরলেন। কাত্যায়নের যাবতীয় ব্যবহারিক সমস্যাগুলির সমাধান করে আজ্ঞা দিলেন স্থানীয় সমস্যা অনুযায়ী যাবতীয় কাজগুলি করতে। এছাড়া দূর-দূড়ান্তে যে প্রত্যন্ত গ্রাম বা জনপদ রয়েছে, যেমন সললবতী নদীর ওপারের নির্জন এলাকাগুলি, থূন নামক ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রাম, উষীরধ্বজ পাহাড়ের ওপারের প্রত্যন্ত এলাকা— এরকম যাবতীয় স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি অল্পসংখ্যক ভিক্ষুদের নিয়ে পরিভ্রমণ করতে আদেশ দিলেন। বুদ্ধের উদার ধর্মনীতির এও এক প্রমাণ।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অবন্তী বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের একটি

বড়ো কেন্দ্র ছিল। সাঁচির স্তূপ এখনও সেই গৌরবময় দিনগুলির স্মৃতি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানকার বৌদ্ধ গুহাগুলি এবং তাদের ভিত্তিচিত্রগুলি সে-সব দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। অবন্তীর পুরাতাত্ত্বিক খনন বা গবেষণাকার্য নানা কারণে চালানো সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সরকারী কাজে খননের সময় পুরাতাত্ত্বিক সমাগ্রী যেন অক্ষত থাকে, সেদিকে বিযেশভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। আশাকরি সরকার এদিকে ভালোভাবে নজর দেবেন।

# গৃহস্থের ধর্ম

ভিক্ষু আর যোগ-বৈরাগ্যের কথা শুনে শুনে সাধারণ লোক ভাবে যে বৌদ্ধ ধর্ম বোধহয় বৈরাগীদের আর গৃহত্যাগীদের জন্যই। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁর গৃহস্থ শিষ্যদের সংখ্যা যা ছিল, তার শতাংশের একাংশও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর সংখ্যা ছিল না। পরবর্তীকালেও এ সংখ্যা একইরকম রয়েছে।

বুদ্ধের উপদেশাবলীর সারতত্ত্ব একটি গাথায় উল্লিখিত হয়েছে—

"সব্বপাপস্স অকরণং কুসলসু পসম্পদা।
সচিত্তপরিয়বদপণং এতং বুদ্ধানুশাসনম্॥"

(কোনোপ্রকার পাপকার্যে লিপ্ত না হওয়া, পুণ্যকার্য সম্পাদন করা এবং আপন মনকে সংযত করা, এটাই বুদ্ধের শিক্ষা)।

গৃহস্থ বা ভিক্ষু, সবার জন্যেই এই এক সমান নিয়ম, সমান শিক্ষা। হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিধি-বিধানসংহিতা যেমন ছিল, তেমনটা গৃহস্থদের জন্যে ছিল না। ত্রিপিটকে 'সিগালোবাদ সুত্ত' নামক সূত্রে গৃহস্থদের জন্যে নিয়ম-বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা সেই যুগের সমাজকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

যাঁদের সন্তান হয়ে মারা যাচ্ছে— সেখানে মা-বাবা, বাচ্চার কোনো একটা অমঙ্গল সূচক, অপভ্রষ্ট নাম রাখেন। তাঁরা ভাবেন, এমনটা করলে যমদূতেরা এই বাচ্চাটির দিকে নজর দেবে না। বুদ্ধের যুগেও এমন ধরনের নাম রাখার প্রচলন ছিল। কোনো এক ধনাঢ্য শেঠ, তাঁর ছেলেকে দীর্ঘজীবী করার জন্যে তার নাম 'সিগাল' (শৃগাল বা শেয়াল) রেখেছিলেন। সিগালকে উপদেশ দেওয়ার মজার ঘটনাটি এই প্রকার—

"একবার ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনে বিহার করছিলেন। সে সময় সিগাল (শৃগাল) নামক এক ধনাঢ্য গৃহপতির ছেলে সকালে উঠে, রাজগৃহ থেকে বেরিয়ে, ভেজা গায়ে, ভেজা কাপড়ে একবার পূর্বদিকে, একবার পশ্চিমদিকে, একবার উত্তরদিকে, একবার দক্ষিণদিকে নমস্কার করছিল।"

"বুদ্ধ ধীর পায়ে সে-সময় রাজগৃহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করছিলেন। তিনি ওইভাবে একটি ছেলেকে চারিদিকে নমস্কার করতে দেখে একটু অবাক হলেন। তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—'কিগো! সাতসকালে উঠে তুমি কাকে এত নমস্কার করছ?'

"নমস্কার করা থামিয়ে ছেলেটি পিট পিট করে বুদ্ধের দিকে তাকাল। তারপর বিজ্ঞের মতো বলল—'আমি আমার পিতার আদেশ পালন করছি'।"

বুদ্ধ, বাচ্চা ছেলেটির কথা বলার ধরন দেখে মনে মনে খুব মজা পেলেন। কিন্তু শান্ত স্বরেই বললেন— "সে তো বুঝলাম! কিন্তু কি আদেশ দিয়েছিলেন তিনি?" ছেলেটি বলল, বাবা বলেছিলেন—"সকালে উঠে সমস্ত দিকগুলিকে নমস্কার করবে। তাই আমি বাবার আদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করছি।"

বুদ্ধ ছেলেটিকে বুঝিয়ে বললেন—"বৎস, আর্যদের ধর্মে তো এভাবে নমস্কার করা হয় না।"

ছেলেটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল—"ভন্তে, তাহলে কী হবে? আপনি আমায় দয়া করে বলুন কীভাবে নমস্কার করতে হয়।"

বুদ্ধ সিগালকে বললেন—"মনে রেখ, যে মদ্যপানের সঙ্গী, সে তোমার সামনে তোমার মতো করে কথা বলবে—আসলে কিন্তু সে তোমার মিত্র নয়।

"কার্যসিদ্ধি হোক বা না হোক—শুভাকাঙ্ক্ষিতাই যাঁর একমাত্র প্রদেয়—তিনিই তোমার মিত্র।

"অতি নিদ্রা, পরস্ত্রী গমন, শত্রুতা উৎপন্ন করা, অনর্থ করা, খারাপ লোকের সঙ্গে ওঠাবসা এবং অতিমাত্রায় কৃপণ হওয়া—এই ছয়টি দোষ মানুষের সর্বনাশ করে।

"যে মানুষ নিজে পাপ করে, পাপাচারে আসক্ত, পাপী-বন্ধুদের সঙ্গেই তার যাবতীয় ওঠাবসা, তার ইহকাল ও পরকাল দুটিই নষ্ট হয়।

"মনে রেখ যে ঋণ গ্রহণ করে— সে দুর্বিপাকে পড়ে হাবুডুবু খায়।

"তোমার এখন কাজ করবার বয়স তাই না?"—কথার ফাঁকে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ ভন্তে—তবে আমার সকালে উঠে কাজ করতে অনিচ্ছা হয়।"—সিগাল বলল।

বুদ্ধ সিগালকে সস্নেহে বললেন—"বৎস, বিশেষ খেয়াল থাকে যেন, খুব গরম পড়েছে, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, শীত করছে, এই ধরনের কথা বলে যে কাজে আলস্য দেখায়— তার কোনোদিন উন্নতি হয় না। যে লোক কাজকেই বড়ো বলে মনে করে, শীত-উষ্ণ বোধকে যে গ্রাহ্যই করে না, সেই উন্নতি করতে পারে।"

সিগাল মোট ছয়টি দিকে নমস্কার করত। বুদ্ধও তাকে ছয়টি দিকে প্রণাম জানানোর কথা বললেন। "এই ছয়টি দিকে ছয়জনকে তুমি প্রণাম জানাবে—

"(১) পূর্বদিকে মা-বাবা (২) পশ্চিমদিকে স্ত্রী-পুত্র (৩) উত্তরদিকে মিত্র এবং অমাত্য (৪) দক্ষিণদিকে আচার্য (৫) উপরদিকে সাধু-বিদ্বানের এবং (৬) নীচেরদিকে দাস এবং মজুরদের।"

এবার এদের সঙ্গে ব্যবহার কীভাবে করবে? বুদ্ধ এ ব্যাপারেও সিগালকে ব্যবহারিক উপদেশ দিলেন—

"(১) মা-বাবার সেবা কেন করবে? কেন না জগতে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আকর একমাত্র মা-বাবাই। শত ঝড় ঝাপটার থেকে তাঁরা সন্তানকে রক্ষা করে থাকেন। সন্তানকে জন্ম দিয়ে তাকে মানুষ করে তোলেন। তাঁদের ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। তবুও বয়সকালে মা-বাবার সেবা করা, কুল-বংশ বজায় রাখা, সম্পত্তির দায়িত্ব নিয়ে সেটির সঠিক দায়িত্ব পালন করা অবশ্য কর্তব্য। মাতা-পিতা ভবিষ্যতেও আমাদের সৌভাগ্যবর্ধক। এঁরা শুধু জন্ম দিয়ে মানুষ করেই খালাস হয়ে যান না। মা-বাবা তাঁদের সন্তানদের পাঁচ প্রকার অনুকম্পা দেখিয়ে থাকেন (১) পাপ থেকে নিবারণ করে থাকেন (২) পুণ্যকাজে নিয়োজিত করান (৩) শিল্পজ্ঞান দেন (৪) যোগ্য স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়ে দেন (৫) সময়মতো দায়মুক্ত করে থাকেন।

"(২) এবার কীভাবে আচার্যের সেবা করবে সে-কথা বলেন, প্রতিদিন তাঁকে সম্মান জানানো, প্রয়োজনীয় উপদেশাদি বলামাত্রই পালন করা, তাঁর ব্যক্তিগত সেবা করা (যদি তিনি অমত বা ক্ষুব্ধতা না প্রকাশ করেন), অসুস্থ হলে তাঁর শুশ্রূষা এবং নিয়মিত সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ করা—এই সব কাজের দ্বারাই তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায়।

"(৩) স্ত্রীর সেবা কীভাবে করবে?— তাকে সম্মান করবে, অপমান করে কটুবাক্য বলবে না, কোনোপ্রকার শারীরিক অত্যাচার করবে না। তার যা প্রয়োজন, সেটি অবশ্যই দেবে। মাঝে-মধ্যে অলংকার আভূষণ ইত্যাদি কিনে দেবে। এতে স্ত্রী ঘরের কাজকর্ম সঠিকভাবে করে থাকে, চাকর বাকরেরা বশে থাকে। সে, সব কাজে উৎসাহী হয়ে থাকে এবং স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করে থাকে।

"(৪) মিত্র এবং অমাত্যদের সেবা কী প্রকারে করবে? কিছু না কিছু দেবেই তাদের হাতে, মিষ্টভাষী হবে, তাদের কাজে সাহায্য করবে, সবাই সমান, কেউ ছোটো বড়ো নয়—এমন ব্যবহার করবে। ভালো ব্যবহার করলে সেই বন্ধু বিপদে রক্ষা করে, সম্পত্তি নষ্ট হতে দেয় না, অসময়ে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়—এবং বিপদকালে একা ছেড়ে পালায় না।

"(৫) নিজেদের বাড়িতে যারা দাস-দাসী, চাকর-বাকর, তাদের প্রতি তোমার ব্যবহার কীরূপ হবে? তাদের ওপর বেশি কাজের চাপ না দেওয়া, খাওয়া-পরা এবং মাইনে সব ব্যাপারেই যথাযথ খেয়াল রাখা। তারা অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাবে, সময়মতো ছুটি দেবে। এমনটা করলে চাকর-বাকরেরা মালিক ওঠার বহু আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে কর্তব্যকর্ম সমাধা করে থাকে, সবাই শুয়ে পড়ার পর, সবকিছু তদারকি করে তারপর শুতে যায়। এরা কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সঙ্গে করে এবং মালিকের প্রশংসাই সর্বত্র করে থাকে।

"(৬) সাধুদের জন্যে সেবার পদ্ধতি সম্পর্কে বুদ্ধ বললেন— শ্রমণদের সঙ্গে শুদ্ধ হয়ে আন্তরিকভাবে তাঁদের সেবা করা, যথাযথভাবে তাঁদের আচার, নীতি রক্ষা করা এবং গৃহস্থের দিক থেকে গৃহত্যাগী সাধকদের নিয়মিত ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত।"

এভাবেই সিগালকে উপদেশের মাধ্যমে বুদ্ধ গৃহীদের নির্দেশক উপদেশগুলিও দিয়ে দিলেন—যার দ্বারা গৃহস্থধর্ম তার প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে।

# অহিংসা

বুদ্ধ করুণার অবতার বলে জগদ্বিখ্যাত। যদিও তিনি ঈশ্বর, বর্ণব্যবস্থা, শাস্ত্র-বেদ ইত্যাদির বিরোধী ছিলেন, তবুও ব্রাহ্মণেরা তাঁকে নবম অবতার বলে মেনেছে এবং আজকের যুগকে বৌদ্ধ অবতারের যুগ বলে অভিহিত করেছে। জয়দেব তাঁর প্রখ্যাত কাব্য 'গীতগোবিন্দ'-তে দশাবতারের স্তুতি করতে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের স্তুতিতে আবেগপ্রবণ হয়ে লিখেছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিরধেহহশ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্॥"

(আহা প্রভু! তুমি সদয়-হৃদয়পরায়ণ হয়ে যজ্ঞ-বিধানে পশুহিংসা কারণে শ্রুতির নিন্দা করতে।)

'সদয়-হৃদয়পরায়ণ' বলে বুদ্ধের প্রশংসা জয়দেব এমনি খেয়ালবশে করেননি। এর পিছনে বুদ্ধের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ছিল। নিজের নিরূপিত পঞ্চশীলে বুদ্ধ 'প্রাণাতিপাতঃ বেরমণী' অর্থাৎ প্রাণী-হিংসা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। সেই ব্যক্তিই যদি মনুষ্যকৃত হিংসার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন—তাহলে এটা স্বাভাবিকই বলতে হবে।

ভিক্ষুদের মধ্যে যদি কেউ মানুষকে হত্যা করে তাহল তার জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অন্তিম দণ্ডবিধিকে বৌদ্ধ পরিভাষা অনুসারে পারাজিকা বলা হয়ে থাকে। পারাজিকার অপরাধীকে সংঘ থেকে চিরতরে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।

প্রাণীদের প্রতি হিংসা কেন করা উচিত নয়, সে ব্যাপারে বুদ্ধ ধম্মপদে যুক্তিসহকারে বলেছেন— সমস্ত প্রাণীই দণ্ডের ভয়ে ভীত হয়, সবাই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, সুতরাং নিজেকে উদাহরণরূপে সামনে রেখে মানুষের কখনও কাউকে হত্যা করা উচিত নয়, বা করতে প্ররোচিত করাও উচিত নয়।

ক্রোধপূর্ণ কথা অত্যন্ত দুঃখজনক—কাউকে দুঃখ দিও না।

প্রাণীরা সুখ চায়—মৃত্যুবরণ করলে সে সুখ আর পাওয়া যাবে না।

—এমন বহু কথা বুদ্ধের জীবনে পাওয়া যায় যেখানে তিনি হিংসার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। অহিংসাকে ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে দুভাবেই প্রসারিত করতে বুদ্ধের প্রচেষ্টা আশাতীতভাবে সফল হয়েছিল। সে যুগে দেবমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। ধনাঢ্য শেঠরা এবং ব্রাহ্মণরা বড়ো বড়ো যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞে পশুবলি অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং এক একটি যজ্ঞে অসংখ্য নিরীহ পশুর রক্তে মাটি লাল হয়ে যেত। এই নৃশংসতাকে ধর্মের নামে চালিয়ে দেওয়া হত।

কুটদন্ত নামক এক ব্রাহ্মণ মগধের রাজা বিম্বিসারের কাছ থেকে ব্রহ্মোত্তর জমি পেয়ে বড়োই সুখে দিন কাটাচ্ছিল। একবার সে এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করে। যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য সাতশো ষাঁড়, সাতশো বাছুর, সাতশো ছাগল এবং সাতশোটি ভেড়া হাড়িকাঠের কাছে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বুদ্ধ পরিব্রাজন করতে করতে একসময় সেখানে

গিয়ে উপস্থিত হন। কুটদন্তও যজ্ঞের জন্যে তদারকির কাজে সেখানে ব্যস্ত ছিল। বুদ্ধের অপরূপ চেহারা দেখে, তেজস্বী মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে কুটদন্ত অভিভূত হল। বুদ্ধকে সে সাদরে আসন গ্রহণ করতে করজোড়ে অনুরোধ করল। বুদ্ধের অনুমান সঠিক ছিল, যখন তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে এখানে যজ্ঞ উপলক্ষ্যে শত-শত পশুকে বলি দেওয়া হবে। তিনি চাইলেন কুটদন্তের হৃদয় পরিবর্তন করতে। বুদ্ধ কুটদন্তকে বললেন—"মহাশয়, আপনি যজ্ঞ করতে চান কিন্তু শাস্ত্রীয় যজ্ঞের মধ্যেও আরও মানবিক, আরও দৈববলে বলীয়ান, শান্তিপূর্ণ যজ্ঞ রয়েছে—তেমন যজ্ঞ কী আপনি করতে ইচ্ছুক?"

কুটদন্ত প্রথমেই এই মহান ব্যক্তিটির সংস্পর্শে এসে আগেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এখন উন্নত যজ্ঞের কথা বলাতে সে সাগ্রহে বুদ্ধের কাছে শুনতে চাইল অন্যরকম যজ্ঞের কথা।

বুদ্ধ তখন তাকে পুরাণের মহাবিজিত রাজা এবং তাঁর পুরোহিতের কথা শোনালেন। বুদ্ধ বললেন—"তারাও যজ্ঞ করেছিল। কিন্তু সে যজ্ঞে কোনো নিরীহ প্রাণীর আর্ত চিৎকার শোনা যায়নি, রক্তে লাল হয়ে মাটি ভেজেনি। কেউ, সেই যজ্ঞে এতটুকু মানসিক অশান্তি পায়নি—শারীরিক তো দূরের কথা। কর্মচারী, চাকর-বাকরেরা চাবুক খাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে চোখ ছলছল অবস্থায় অপমানিত, ক্ষুব্ধ হয়ে কাজ করার জন্যে বাধ্য হয়নি। সে ছিল অন্য যজ্ঞ। প্রথমে তারা দশটি প্রধান সদাচার পালন করেছে। তারপর কাউকে এতটুকু কষ্ট বা অশান্তি না দিয়ে যজ্ঞ সমাধা করেছে। দণ্ড বর্জিত, ভয় বর্জিত, বলি বর্জিত এই মহাযজ্ঞে যারা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চেয়েছিল তারা করেছে, যারা করতে চায়নি, তাদের ওপর সামান্যতম জোরও খাটানো হয়নি। ঘি, তেল, মাখন, দই, মধু, গুড় ইত্যাদি দিয়ে যজ্ঞ সমাপ্ত হল। এই হল সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের কথা।"

কুটদন্তের দুচোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। জোড়হাতে সে বুদ্ধের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—"হে ভগবান! আপনি আমায় পাশবিকতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। প্রভু, আপনার কথায় আমার হৃদয়ে এক অসাধারণ ভাবের উদয় হয়েছে। যে যজ্ঞের ভিত্তি প্রাণীহত্যা আর নির্যাতনের ওপর প্রতিষ্ঠিত—তা যজ্ঞই নয়। আমি খুঁটিতে বাঁধা এই সমস্ত পশুগুলিকে এই মুহূর্তে মুক্তি দিলাম। তারা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াক। এই সবুজ পৃথিবীতে তারা শান্তিতে বেঁচে থাক।"

বুদ্ধের সমকালীন জৈন ধর্মের ২৪তম তীর্থংকর বর্ধমান মহাবীরও অহিংসার বিরাট বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি প্রাণীহত্যার এতদূর বিরোধী ছিলেন যে, কীট-পতঙ্গ, পিঁপড়ে, মশা-মাছি, দৃশ্য, অদৃশ্য যাবতীয় জীবনের প্রতিই অহিংসামূলক আচরণ করতে বলতেন। বুদ্ধ অতিবাদী ছিলেন না। তিনি মধ্যমমার্গী ছিলেন।

বলা হয়, ব্রাহ্মণেরা আগে এত সহিংস পূজা-যজ্ঞ ইত্যাদি করত না। প্রাচীনকালে তাদের যজ্ঞে এত নৃশংসতা বা প্রাণীহত্যা ছিল না। যখন এদের মধ্যে লোভ জন্মাল, তখন ধর্মের নামে তারা পশুবলি দেওয়া শুরু করল। 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থে 'ব্রাহ্মণধম্মিয় সুত্ত' অধ্যায়ে বুদ্ধের কোশলের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথোপকথনকে তুলে ধরা হয়েছে। বুদ্ধ বলে চললেন—

"প্রাচীন ঋষিরা সংযমী এবং তপস্বী হতেন।

ইন্দ্রিয়ভোগ বাদ দিয়ে তাঁরা সর্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত থাকতেন।''

সেইসব মহান ব্রাহ্মণদের কাছে পশু, সোনা বা আনাজ, কিছুই ছিল না। জ্ঞানচর্চাই তাঁদের নিত্যক্রিয়া ছিল—ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হয়ে তাঁদের দিন কাটত। রাজারা, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, জনপদের অধিবাসীরা মাথা নুইয়ে তাঁদের সম্মান জানাত। তাঁদের কেউ কোনো ক্ষতি করত না, কেউ বধ করত না, কেউ উপহাস করত না। এঁরা আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতেন।

সাধারণ তণ্ডুল বা চাল, বস্ত্র, ঘি এবং তেলের দ্বারা ধর্মীয় মতে তাঁরা যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞে গো-বধ করা হত না। তাঁদের কল্যাণ কার্যে পৃথিবী শস্যশ্যামলা হত। কী ভালো আর কী মন্দ, কী উচিত আর কী অনুচিত জেনে তাঁরা যাবতীয় কার্য করতেন। কিন্তু সে সময় আর রইল না, সে বোধ আর থাকল না, রাজার বিলাসিতা, অলংকারে সজ্জিত সুন্দরীরা, টগবগে ঘোড়ায় চড়া, বহুবর্ণে চিত্রিত চিত্রে সুশোভিত রথে চড়ে ধনাঢ্যদের যাতায়াত—ত্যাগের মহীয়ান পথকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে দিল। তাঁদের ত্যাগপূত মনে বাসনা ও বিলাসের কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

প্রলুব্ধ হয়ে ব্রাহ্মণেরা রাজার কাছে গেল—তাঁদের মনে তখন লালসার লোলুপ ছোঁয়া। তাঁরা বললেন— হে রাজন! তুমি ধনেধান্যে পরিপুষ্ট, বিত্তে-বিলাসে তোমার বিচরণ, এই অর্থের ব্যবহার কর—যজ্ঞ কর তুমি। আমাদের প্রাপ্য ভোগ্যবস্তু প্রদান কর। ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পুণ্যলোভাতুর রাজা একের পর এক যজ্ঞ করে চলল—বিলাসিতা, আড়ম্বর আর অহংকারের সে এক বিষাক্ত ত্রিবেণী সঙ্গম। অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ, বাজপেয়— না জানি কত নামে বাসনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা নব নব রূপে পরিচিত হল।

রসনালোলুপ ব্রাহ্মণেরা বললেন—হে রাজা, যেমন জল, মাটি, সোনা মানুষের ভোগ্যবস্তু— তেমনই পশুরাও ভোগ্যবস্তু, এদের উৎসর্গ কর।

রাজা অবিবেচক হয়ে—শত শত প্রাণীকে হত্যা করল—বলি দিল তাদের। রক্তে লাল হল মাটি, নিরীহ পশুর আর্ত চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হল দিগন্তের ধূসরতা।

স্বর্গলোক থেকে বর্ষিত হল অভিশাপ—বলা হল, ধর্মের নামে প্রাণী হত্যা করে ঘোরতর অধর্ম করা হয়েছে।

আগে পৃথিবীতে তিনটি মাত্র ব্যাধি ছিল—'ইচ্ছা, ক্ষুধা ও বার্ধক্য'। এখন পশু হিংসার দ্বারা সেগুলি আটানব্বইটি দোষ-ব্যাধি-বেদনায় পরিণত হল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আমরা জানতে পারি, বুদ্ধের আগে যে কোনো যজ্ঞই হোক, সেখানে পশুহিংসা অবশ্য পালনীয় নিয়ম ছিল। ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতম ঋষিদের মধ্যে ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং তাঁদের যজমান রাজা দিবোদাস এবং সুদাস সপ্তসিন্ধু সে যুগে বিশেষভাবে যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। সুপুষ্ট ভেড়া এবং বৃষের (ষাঁড়) বলি নিয়মিত দেওয়া হত এঁদের যজ্ঞে। তবুও পাশাপাশি কোনো পরম্পরা এমন নিশ্চয়ই ছিল যাঁরা হিংসার কঠোর বিরোধিতা করে এসেছেন যুগে যুগে।

জাতক কথাগুলিতে অহিংসা ব্রতকে আরও বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। নিজের জন্যে

প্রাণীহত্যা করা তো দূরের কথা, ক্ষুধার্ত বাঘিনি এবং তার শাবকদের জন্যে নিজের শরীরকে আহার্যরূপে দান করার কথাও উঠেছে। এর থেকে বোঝা যায়, অহিংসার বিষয়টিকে বুদ্ধ কতটা মূল্য দিতেন। বুদ্ধের সওয়া দুশো বছর পরে সম্রাট অশোকের সময়কাল। অহিংসার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অশোক তাঁর প্রাসাদের ভোজনশালায় আমিষ খাদ্যের রান্না, বা পশুহত্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন। সে যুগে মাংস আজকের ন্যায় সখের খাবার ছিল না। সেটা তখনকার মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার আওতায় পড়ত। উত্তর প্রদেশে আজ যেখানে ছয় কোটি মানুষের বাস— সে যুগে পঞ্চাশ লাখও ছিল না বলা চলে। সব স্থানেই গভীর জঙ্গল, যাতে শিকারের উপযোগী অসংখ্য পশুর বাস ছিল। বড়ো বড়ো সরোবর, ঝিল, দিঘির ছড়াছড়ি ছিল যাতে সুস্বাদু মাছের অভাব ছিল না। এমন মাটিতে বাস করে যদি মাছ-মাংস প্রধান আহার হয়, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? বাংলার উদাহরণ তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। মাছ বঙ্গদেশে এতটাই সুলভ যে, সেখানে ওটিকে আমিষ নয়, নিরামিষের আওতায় রাখা হয়। যেখানে মাছ-মাংস এতটাই সুলভ, সেখানে ভিক্ষাতেও আমিষ ভোজনের প্রচলন স্বাভাবিক বলা যেতে পারে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও দৈনন্দিন আহারের দিক থেকে সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনানুসারে আমিষাহার গ্রহণ করতেন। বুদ্ধও এক্ষেত্রে হিংসার বিরোধ করলেও আমিষ আহারের বিরোধিতা করেননি। তিনি নিজেও মাংসভোজনের ব্যাপারে কখনও 'না' করেননি। বুদ্ধের জীবনের বেশ কিছু ঘটনা আমাদের এই তথ্যটি প্রমাণিত করে।

বুদ্ধের শালা (যশোধরার ভাই) দেবদত্ত বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দেবদত্তের মনে ইচ্ছে হল যে সে-ই বুদ্ধের আসনে বসবে। কিন্তু বুদ্ধ কাউকেই মহন্তপদে বসাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। গুরুগিরির পরম্পরা চালানো তিনি একান্ত অপছন্দ করতেন। তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের, উপাসক-উপাসিকাদেরই সংঘের উত্তরাধিকারী বলে মানতেন। যখন দেবদত্ত বুঝতে পারল যে গণতান্ত্রিক মতে পরিচালিত সংঘে স্বৈরাচারীর স্থান নেই, তখন ঈর্ষায়, হিংসায় পাগল হয়ে দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করবার চেষ্টা করে। ভারী পাথর ফেলে ভিক্ষুসংঘের সভায় বুদ্ধকে মারার চেষ্টাও করেছিল সে। এই ষড়যন্ত্রের আর একটা বড়ো উদ্দেশ্য ছিল যে বুদ্ধকে দিয়ে এমন কিছু নিয়ম পালন বা বিধান দেওয়াতে বাধ্য করা, যেগুলি নিতান্তই অব্যবহারিক। যদি বুদ্ধ সেগুলি মঞ্জুর না করেন, অনুমতি না দেন—তখন বুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং জনসমক্ষে অপপ্রচারের দ্বারা তাঁর বদনাম করা। বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গের সংঘভেদক স্কন্ধে এই ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে—দেবদত্ত একবার বুদ্ধের কাছে গিয়ে পাঁচটা নিয়মকে সামনে রাখল— "(১) ভিক্ষু সারা জীবন বনবাসী হবে, যে গ্রামে থাকবে সে দোষী (২) তারা সারাজীবন মাধুকরী করে খাবে, যদি কেউ নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সেখানে আহার করে— সে দোষী (৩) ভিক্ষু সারা জীবন পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাঁথা পরে লজ্জা নিবারণ করবে। যদি কেউ গৃহস্থের দান করা নতুন বস্ত্র গায়ে দেয়— সে দোষী। (৪) সারাজীবন সে বৃক্ষতলে বাস করবে। যদি কেউ ছাদের তলায় আশ্রয় নেয়— সে দোষী এবং (৫) সারাজীবনেও সে আমিষ আহার করতে পারবে না— যদি কোনোদিন মাছ বা মাংস খায় তাহলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে।"

বুদ্ধ সব কথা শুনে বললেন—"দেখ দেবদত্ত, যার ইচ্ছা সে কাঁথা পরুক, যার ইচ্ছা সে

গ্রামে থাকুক বা মাধুকরী করে খাক। ..... আমি আটমাস বৃক্ষতলে থাকার অনুমতি দিয়েছি। অদৃষ্ট, অশ্রুত এবং অপরিশঙ্কিত— তিন ধরনের পরিশুদ্ধ মাংস খাবার অনুমতিও দিয়েছি। 'অদৃষ্ট' মানে 'আমার জন্যে মারা হয়েছে' এটা সে দেখেনি। 'অশ্রুত' মানে 'আমার জন্যে মারা হয়েছে' এটা সে শোনেনি। অপরিশঙ্কিত মানে হচ্ছে 'আমার জন্যে মারা হয়েছে'—এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এমন ধরনের রান্না করা মাংস তখনও পাওয়া বিরল ছিল না, আজও পাওয়া বিরল নয়। ভিক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে যাওয়া ভিক্ষুর জানা সম্ভব নয় যে, আজ কার ঘরে কী রান্না হয়েছে। আবার দ্বারে ভিক্ষার জন্যে এসে দাঁড়ানো ভিক্ষুর জন্যই সেই মাংস তৈরি হয়েছে—এটাও জানা সম্ভব নয়। তাই তিনপ্রকারে পরিশুদ্ধ মাংসকে আমি নিজের বা সংঘের ক্ষেত্রে অভক্ষ্য বস্তু বলে পরিত্যাগ করার কথা বলিনি। আজ নিরামিষ আহারের পক্ষপাতীরা বলতে পারেন যে, এটা কেবল নিছক অজুহাত। যদি মাছ-মাংস লোকেরা না-ই খায়—তাহলে প্রাণীরা মিছামিছি মানুষের হাতে মারা পড়বে কেন? সে যুগেও এমন কথা উঠেছিল। তাই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে মাছ-মাংসকে বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ইত্যাদি মহাযান প্রধান বৌদ্ধ দেশগুলিতে এই নিয়ম সর্বতোভাবে মানা হয় না। সেখানে নিরামিষ খাওয়া লোকের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু চিনের ভিক্ষুরা অত্যন্ত কঠোরভাবে আমিষ-নিরামিষ মেনে চলেন। গৃহস্থ চিনা ব্যক্তির প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় যেমন মাংসের ছড়াছড়ি— তেমনই চিনা ভিক্ষুরা আমিষ খাদ্য স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। এর ভালো ফল এই হয়েছে যে চিনা ভিক্ষুরা বিভিন্ন রকমের নিরামিষ আহার অতি উপাদেয়ভাবে তৈরি করতে শিখেছেন।

ভালোভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে খাদ্যের ব্যাপারে বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানসম্মত। যদি প্রতিটি আহার্য বস্তু, কী আমিষ আর কী নিরামিষ তৈরি বা আহরণের পদ্ধতি আমরা লক্ষ করি— সেক্ষেত্রে প্রাণীহত্যা ছাড়া কিছু করাই সম্ভব নয়। খেতে হাল চালানোর সময় কত কীট পতঙ্গ মারা যায়। ধানের জমিতে তো এই মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক-অনেক বেশি বেড়ে যায়। বৃষ্টি হওয়ার জন্যে হাজার হাজার কেঁচো মাটির উপর সে সময় নড়েচড়ে বেড়ায়। আজকাল ফসল রক্ষা করার জন্যে যে বিষাক্ত কীট- নিরোধক ওষুধ ছড়ানো হয়— সেক্ষেত্রে হাজার হাজার কীটপতঙ্গের মৃত্যু হয়। যদি এভাবে আমরা ভাবি বা প্রতিমুহূর্তে হিংসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে যাই—তাহলে তো খাদ্য গ্রহণ করাই একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া খালি চোখে না দেখতে পাওয়া কোটি কোটি জীবাণুর কথা? যেগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাই একমাত্র দেখা সম্ভব? বুদ্ধ কাপড়ে জল ছেঁকে নিয়ে জল পান করার কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে জৈনরা আরও বেশি কঠোরতা অবলম্বন করে থাকে।

হিংসা এবং অহিংসার সীমা আছে। অহিংসা মানুষ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পালন করতে পারে। কেন না জীবনটাই হিংসার উপর নির্ভর করে রয়েছে। শুধু খাওয়া-দাওয়াতেই নয়, সামান্য শ্বাস নিতেও হিংসা এবং প্রাণের হানি হয়। যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, নিজেরা নিরামিষাহারী, তাঁরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কত গরিবের মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছেন। এর চেয়ে বড়ো হিংসা এবং দুরাচারিতা আর কী হতে পারে?

বুদ্ধ অনীশ্বরবাদী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই, কিন্তু অনেকেই বুদ্ধকে ঈশ্বরভক্ত প্রমাণিত করার চেষ্টা করে এবং বুদ্ধের অহিংসার ব্যাপারেও লোকেরা মনগড়া কথা বলে থাকে। মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে বুদ্ধ তিন প্রকারে পরিশুদ্ধ মাংস ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। তৎকালীন ভদ্র জনেরা যে মাংসকে আহার করার যোগ্য বলে মানতেন—বুদ্ধও সেই একই বস্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বিনয়পিটকে অভক্ষ্য মাংসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"তখন ভগবান পরিব্রাজন করতে করতে বারাণসীতে এলেন। বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে তাঁরা বিচরণ করছিলেন। সে সময় সেখানে সুপ্রিয় ও সুপ্রিয়া নামক দুই উপাসক-উপাসিকা বাস করতেন। তাঁরা দাতা ছিলেন এবং সংঘের সেবা করতেন। একবার সুপ্রিয়া বিভিন্ন বিহারে গিয়ে গিয়ে ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—'ভন্তে, এখানে রোগী কেউ আছেন কী? কার জন্যে কী নিয়ে আসতে হবে?'

"সে সময় একজন ভিক্ষু জোলাপ নিয়েছিলেন। তিনি আস্তে আস্তে সুপ্রিয়াকে বললেন—'বোন, আমি জোলাপ সেবন করেছি। আমার পথ্যের প্রয়োজন।'

"ঠিক আছে আর্য, আমি নিয়ে আসছি।'—বলে ঘরে গিয়ে চাকরকে তিনি হেঁকে বললেন—'যারে, রান্না করা মাংস নিয়ে আয়।'

"চাকর উত্তর দিল—'আর্যে, মাংস তো রাঁধা নেই। আজ মারা হয়নি।'

"শেষে সুপ্রিয়া নিজের মাংসই কেটে ভিক্ষুকে রান্না করে খেতে দিলেন। ভিক্ষু না জেনে সেটি খেলেন। যখন বুদ্ধের কানে কথাটা গেল তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং কুপিত হয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন—'মূর্খ! না দেখে, না শুনে কেমন করে তুমি এই মাংস খেলে? তুমি মানুষের মাংস খেয়েছ?'—এবং তৎক্ষণাৎ বুদ্ধ সংঘে এই কঠোর আদেশ জারি করলেন—'ভিক্ষুগণ, কখনও, কোনোভাবেই, মানুষের মাংস ভক্ষণ করবে না।' একইভাবে হাতি, ঘোড়া, কুকুর, সাপ, বাঘ বা সিংহ, চিতাবাঘ, ভালুক, খেঁকশিয়াল, নেকড়ে—ইত্যাদির মাংসকে কঠোরভাবে বুদ্ধ অভক্ষ্য বলে পরিগণিত করেছেন।"

বুদ্ধ অহিংসার সমর্থক ছিলেন এবং প্রতিটি প্রাণীর প্রতি সদয় ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনোকিছুরই অতিরিক্ত পছন্দ করতেন না। মানব-জীবনের ব্যবহারিক সত্যটাকে তিনি বুঝতে পারতেন। হিংসার মূলে বৈরীতাই পরম কারণ। তাই বুদ্ধ বলেছেন—

"ন হি বেরেন বেরানি সম্মতিধা কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥"

(বৈরীতার থেকে বৈরীতার শান্তি কখনও হতে পারে না, একমাত্র অবৈরীতার থেকেই বৈরীতার মূলোচ্ছেদ হতে পারে। এটাই সনাতন ধর্ম।) (ধম্মপদ ১-৫)

## ভৈষজ্য-গুরু

বুদ্ধের পরিচয় কেবল অহিংসার প্রচারক হিসেবেই নয়, তিনি একজন মহাশক্তিধর যোগীও ছিলেন। শঙ্করাচার্যের ন্যায় ব্যক্তি বুদ্ধকে 'যোগীনাং চক্রবর্তী' বলে অবিহিত করেছেন। দার্শনিক রূপেও তাঁর দর্শন আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের এখানে বহু কম লোকই জানে যে বৌদ্ধ দেশগুলিতে বুদ্ধের অন্যতম পরিচয়— 'ভৈষজ্য-গুরু' নামে। তিব্বত, চিন এবং জাপানে বুদ্ধের ভৈষজ্য-গুরু নামে আলাদা মূর্তি রয়েছে। এরূপ বৌদ্ধমূর্তিগুলিতে আরোগ্যের প্রতীক সংলগ্ন রয়েছে। বহু বৌদ্ধ দেশে, আজ থেকে হাজার বছর আগেও অসংখ্য দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। এগুলিতে রোগীদের দেখাশোনা খুব ভালোভাবে করা হত। কম্বোজে চিকিৎসার ব্যবস্থা কীরূপ ছিল সেটা আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে জানতে পারি।

বসন্তকালে চৈত্রের অষ্টমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতি বছর বৌদ্ধ পরম্পরা অনুসারে বসন্তোৎসব পালিত হয়। এর সঙ্গে দুটি যজ্ঞও করা হত। কৃষ্ণাচতুর্দশীতে ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করা হত। সে সময় প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তিও কাছে রাখা হত এবং পূর্ণিমাতে বীর, শক্তি ইত্যাদি অন্যান্য দেবতাদেরও রাখা হত। সে সময় নর্তক-নর্তকীরা চারদিকে নৃত্য করতে করতে অনুষ্ঠানের শোভাবৃদ্ধি করত। সাধারণ লোকেরা সত্য-সদাচার ইত্যাদি গুণগুলি যথাসাধ্য পালন করত। তিনজন গুরু, এক হাজার দেবতা এবং ছ'শো উনিশ জন দিব্য শক্তিকে ভেট-পূজা ইত্যাদি দেওয়া হত। ভিক্ষুদের এবং ব্রাহ্মণদের ভূরিভোজন করানো হত। জয়বর্মার নির্মিত আরোগ্যশালার বিবরণ এইরূপ— "ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ১১৭টি আরোগ্যশালা এবং ৬৯৮টি ঔষধালয় স্থাপিত হয়েছে। এতে যে রোগীরা ভর্তি হয়েছে তাঁদের জন্য সাড়ে তিন লাখ মন আনাজ প্রতি বৎসরে বরাদ্দ হবে। হাসপাতাল এবং ঔষধালয়ের খরচ চালানোর জন্য ৮৩৮টি গ্রামের প্রয়োজন হয়েছে। সরকারী ভাণ্ডার থেকে অন্ন ছাড়া যে জিনিসগুলি দেওয়া হত সেগুলি হল—মধু, মোমবাতি, পীপল, জোয়ান, ক্ষার, এলাচ, শুকনো আদা এবং ওষুধের ১৯৬০টি ছোটো ছোটো বাকসো। রাজা জয়বর্মা এই যাবতীয় সাহায্য করেছিলেন। শেষে রাজা প্রার্থনা করেছিলেন— আমার এই পুণ্য কর্মের জন্য আমার মা ভবসাগরের পারে মুক্ত হয়ে যেন বুদ্ধপদ লাভ করেন।"

প্রশস্তির শেষে লেখা হয়েছে যে রাজা জয়বর্মার পুত্র শ্রীসূর্যকুমার এটি মহাদেবীর সাম্মানে বানিয়েছে।

রাজা সপ্তম জয়বর্মার আরোগ্যশালা সম্পর্কিত দশটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। লিখিত প্রশস্তিগুলি সবকটিই প্রায় একই রকম। শিলালিপিতে প্রথমে বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, ধর্ম, এবং নির্বাণ— এই তিনটি কাজকে নমস্কার জানানো হয়েছে। রোগরূপী অন্ধকারকে দূর করতে সক্ষম ভৈষজ্য-গুরু বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, সূর্য বৈরোচন, চন্দ্ররোচী, চন্দ্র বৈরোচন এবং রোহিনীশের মহিমা-গান করা হয়েছে।

তারপর রাজা জয়বর্মার ব্যাপারে লেখা হয়েছে। বলা হয়েছে—"মানুষের শারীরিক কষ্ট রাজার হৃদয়ে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। রোগীর চেয়েও রাজার কষ্ট বেশি ছিল, তার কারণ প্রজাবৎসল রাজা প্রজার দুঃখে দ্বিগুন দুঃখবোধ করেন।" চিকিৎসাশাস্ত্রে নিপুণ বৈদ্যদের সাহায্যে, তিনি প্রথমে রোগগুলি নষ্ট করলেন। শিলালিপি থেকে জানা যায়—যে আরোগ্যশালাগুলি বুদ্ধ-ভৈষজ্য গুরুর মন্দিরের চারপাশে নির্মিত করা হত। এগুলিতে জাতি বা বর্ণগত কোনো ভেদ-ভাবের ব্যাপার ছিল না এবং সেটি সবার জন্য মুক্ত ছিল। এতে দুই ধরনের ভৃত্য থাকত। যারা আরোগ্যশালা ভবনে থাকত তাদের স্থিতিদায়ী বলা হত এবং যারা বাইরে থাকত তাদের স্থিতিদা বলা হত। প্রথম শ্রেণিতে দুজন চিকিৎসক, দুজন সেবক, দুজন ভাণ্ডারি, দুজন রাঁধুনি, দুজন ওষুধ প্রস্তুতকারক, চোদ্দোজন ধাত্রী বা ধাই এবং আটজন মহিলা ছিল, যাদের কাজ ছিল চাল কোটা। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৬৬জন লোক ছিল, তারপর জিনিসের বিশেষ করে ওষুধপত্রের একটি বিশাল সূচিপত্র দেওয়া হয়েছে— যা রাজকীয় ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেক রোগীকে দেওয়া হয়েছিল। আরোগ্যশালার দিক থেকে গ্রামের লোকদের যে সুবিধা দেওয়া হত, তার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ করমুক্ত ছিল এবং পশুদের উপর অত্যাচার করলে দণ্ড পেতে হত।

কম্বোজরাজ সপ্তম জয়বর্মা যিনি কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের সমকালীন ছিলেন, তিনি তাঁর রাজ্যে ১০২টি হাসপাতাল এবং ৭১৯৮টি ভৈষজ্য-গুরু মন্দির বা ঔষধালয় স্থাপিত করেছিলেন।

শারীরিক ব্যাধির ত্রাতা রূপে বুদ্ধের এই স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং কালে বহু ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে সফল হয়েছে। সর্বপ্রথম অশোক এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং স্থানে স্থানে মানুষ ও পশু সবার জন্যেই চিকিৎসালয় খোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওষুধ এবং জড়িবুটি ভৈষজ্য দ্রব্য ইত্যাদি তিনি সুদূর গ্রিসেও পাঠিয়েছিলেন। জয়বর্মা ১১৩০ সালে চম্পা নগরী বিজয় করেন। তার দুই বছর আগেই মহম্মদ ঘোরি ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

যেখানেই বুদ্ধের বাণী প্রসার লাভ করেছে, সেখানেই এই একই প্রভাব জনমানসের চিত্তে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বুদ্ধ আদর্শবাদী ছিলেন, কিন্তু কল্পনার জগতে বিচরণ করতেন না। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'-কেই যে মানুষটি জীবনের সব কার্যপ্রণালীরই প্রধান ধর্ম বলে ভাবতেন, তিনি লোকের শারীরিক ব্যাধিকে কী করে উপেক্ষা করবেন? বুদ্ধের জীবনে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায়, যার দ্বারা বোঝা যায় যে লোকের মানসিক ব্যাধি এবং চিন্তা দূর করার ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে শারীরিক ব্যাধিগুলি নির্মূল করতে চাইতেন। তিনি করুণার অবতার ছিলেন। নিজের আশেপাশে দীন-দুঃখীদের কাছে সবসময়ে যেতেন— তাদের সহমর্মী হয়ে সান্ত্বনা দিতেন। বিনয়পিটকের মহাবগ্গ খণ্ডে একটি এমনই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। — পূর্বেই উল্লিখিত ঘটনাগুলির সারাংশ—

"একজন ভিক্ষু পেটের অসুখে ভুগছিলেন। বুদ্ধ নিজে হাতে তাঁর মলমূত্র ধুয়ে মুছে তাঁকে সুশ্রূষা করে রোগমুক্ত করলেন। এরপর বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে নির্দেশ দিলেন যে অসুস্থ রোগীর বা ভিক্ষুর সবসময় সেবা করতে—। বুদ্ধ স্পষ্ট স্বরে বললেন— 'যে রোগীর সেবা করে, সে আমার সেবা করে'।".....

বুদ্ধকে কয়েকটি রোগীকে সেবা করার জন্যেই ভৈষজ্য-গুরু বলে অভিহিত করা হয়নি। তাঁর সময়কালে ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র যতটা উন্নতি করেছিল— তার পূর্ণ জ্ঞান তথাগতের ছিল। তিনি তাঁর এই ভৈষজ্য-জ্ঞান অগণিত শিষ্যের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ভৈষজ্য-গুরু এই পরম্পরা এতটাই বিস্তৃত হয়েছিল যে প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে বা মঠে চিকিৎসকের সংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডকের জেতবনে থাকাকালীন বুদ্ধ শুনতে পেলেন যে একজন ভিক্ষু প্রচণ্ড জ্বর থেকে সবে মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু শরীর তাঁর পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় তিনি যা খাচ্ছিলেন তাই বমি হয়ে যাচ্ছিল। খাদ্য হজম না হওয়ার জন্য সেই ভিক্ষুটির চেহারা কৃশ, কঙ্কালসার, আকার ধারণ করেছিল। সবাই যথাসাধ্য তাঁর সেবাকার্য করে চলছিলেন।

বুদ্ধ শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারটা নিয়ে সেদিন খুব গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর তিনি মনস্থ করলেন যে, সেদিনের ধর্মসভায় তিনি ভৈষজ্য সম্বন্ধেবক্তব্য রাখবেন। বিকেলবেলা আত্মধ্যানের পর আসন থেকে উঠে বুদ্ধ সেদিনের ধর্মসভায় ভৈষজ্য সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন—

হলুদ, আদা, খসখস, নাগরমাথা, নিম, কুটজ, পিপ্পলী, মরিচ, বহেড়া, আমলকী ইত্যাদির নানা প্রকার প্রয়োগ তুলে ধরলেন। সৈন্ধব লবণ, কালো লবণ, ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত ওযুধের কথা বললেন। নানা প্রকার সুলভ ও দুর্লভ চোখের ওষুধ এবং চর্মরোগের চিকিৎসা থেকে শুরু করে সেদিনের ধর্মসভায় বহু পরিচিত অপরিচিত গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে প্রয়োগবিধিকে প্রাঞ্জল করে সবার সামনে তুলে ধরলেন। এত অসংখ্য রোগমুক্তির পথ বললেন তিনি যে সংঘে সবাই তাঁকে ভৈষজ্য-গুরু রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

## জন্ম নয় গুণ

বুদ্ধ ভারত-মাতার এক অসাধারণ সন্তান ছিলেন। যে কোনোভাবেই তাঁকে দেখা যাক, বুদ্ধের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে অতিমহান করে তুলেছে। বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষ প্রাচীনকালে এবং আধুনিক যুগে গান্ধীর ন্যায় মহামানব এলেও, জাত-পাত, ছুঁতমার্গ, সমাজে উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গকে ঘৃণার চোখে দেখা, তাদের সামাজিক স্তরে অত্যাচার করা বা প্রাণে মেরে ফেলা— এই পৈশাচিক বর্বরতা প্রশ্রয় পেয়ে রক্তবীজের ন্যায় এখনও টিকে আছে। আড়াই হাজার বছর আগে সামাজিক চিত্র এখনকার চেয়ে নিশ্চয়ই উন্নত ছিল না। বুদ্ধ সমতার প্রচারব ছিলেন। গৃহী শিষ্যদের ক্ষেত্রে আর্থিক সাম্যবাদ হয়তো অব্যবহারিক ভেবে তিনি বিশেষ জোর দেননি, কিন্তু ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের প্রশ্নে আর্থিক সাম্যবাদের উপর তিনি খুবই জোর দিতেন। যদিও বুদ্ধের দেহত্যাগের পর একশো বছরও অতিক্রান্ত না হতেই বৈশালীতে ভিক্ষুরা অর্থ জমাতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং তার দ্বারাই বৌদ্ধদের দ্বিতীয় সংগীতি বা পরিষদ বা পঞ্চায়েত গঠন হয়েছিল।

বর্ণ ব্যবস্থা বা বর্ণভেদের বিরোধ বুদ্ধের উপদেশে প্রায়ই পাওয়া যায়। এখনকার বিহারের মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং সহরসা জেলার জনপদকে সে সময় অঙ্গ জনপদ বলে অভিহিত করা হত। যদিও সেটা স্বাধীন না হয়ে মগধের অধীন ছিল তবুও এর রাজধানী চম্পা, গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা একটি সুন্দর বাণিজ্যিক নগরী ছিল। আজও ভাগলপুর শহরের একটি ভাগ চম্পা নগরী নামেই টিকে আছে। বুদ্ধ অঙ্গদেশ পরিব্রাজন করতে করতে চম্পা নগরী পৌঁছলেন। তিনি সেখানকার গর্গরা পুস্করিণীর তীরে একটি বাগানে ছিলেন। চম্পাকে মগধরাজ বিম্বিসার একজন পূজনীয় ব্রাহ্মণ সোনদণ্ডকে প্রদান করেছিলেন। বুদ্ধের খ্যাতি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে ছিল, তাই তারা যেখানে বুদ্ধ যেতন সেখানেই জমায়েত হত । বিদগ্ধ লোকেরা দর্শন এবং উপদেশের জন্য বুদ্ধের কাছে আসতেন। আপামর জনসাধারণ ছাড়াও সোনদণ্ড যখন জানতে পারলেন যে তথাগত বুদ্ধ এসেছেন, তখন তিনি আরও বহু ব্রাহ্মণ সহ বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

সোনদণ্ড নিজে প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিত হিসেবে তাঁর প্রচুর যশ ও খ্যাতি ছিল। পথে হাঁটতে হাঁটতে সোনদণ্ড ভাবছিলেন— "বুদ্ধকে প্রশ্ন করতে যদি কোনো ভুল করি, এবং তিনি যদি আমার ভুল ধরে ফেলেন, তাহলে পণ্ডিতমণ্ডলী ভাববে সোনদণ্ড ব্রাহ্মণ নিতান্তই অজ্ঞ—একটা প্রশ্নও ঠিকমতো করতে পারে না। এরকমভাবে যদি লোকেরা আমায় তিরস্কার করে— স্বাভাবিকভাবেই আমার নামযশ কম হয়ে যাবে। নামযশ কম হলে ভোগবিলাসও আর আগের মতো থাকবে না। কেন না যশোলাভের সঙ্গে অর্থলাভও জড়িয়ে থাকে। অর্থ কমে গেলে, ভোগ ইত্যাদির প্রাচুর্যও কমে যাবে। আবার বুদ্ধের কোনো প্রশ্নের যদি আমি জবাব না দিতে পারি তখনও এই একই অবস্থা হবে। আবার এত কাছে এসে ফিরে যাওয়াটাও ঠিক নয়। তাতে লোকেরা বলবে— সোনদণ্ড ব্রাহ্মণ খুব অহংকারী এবং ভীরু।

এই সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সোনদণ্ড ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। মনে মনে এই কথাগুলি ভাবছিলেন আর তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল যদি বুদ্ধ তাঁর জানা কোনো বিষয় সম্পর্কে চর্চা করতেন। অন্তর্যামী তথাগত সোনদণ্ডের মনের কথা বুঝতে পেরেই বললেন—

"মহাশয়, কোন্ কোন্ গুণ থাকলে আমরা একটি পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলতে পারি?" সোনদণ্ড বুদ্ধের প্রশ্ন শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এই তো! বুদ্ধ এমন প্রশ্ন করেছেন, যার উত্তর দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি আমিই। —সোনদণ্ড উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেলেন— "কয়েকটা গুণ আছে, যেগুলি আমরা ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ বলে জানতে পারি—(১) মাতা ও পিতা দুজনই সদ্‌বংশের সন্তান হবেন (২) যে বেদাধ্যায়ী, মন্ত্রের জ্ঞাতা এবং বেদজ্ঞ হবে (৩) সুন্দর, সুপুরুষ, পরিচ্ছন্ন গাত্রত্বকযুক্ত হবে (৪) সদাচারী হতে হবে এবং (৫) পণ্ডিত ও মেধাবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ-দক্ষিণা প্রাপকদের মধ্যেও তাঁকে উচ্চ স্থানে রাখতে হবে।"

বুদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করলেন— "এই পাঁচটি গুণের মধ্যে কোনো একটি ছাড়া কি কাজ চলতে পারে— ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যেতে পারে?"

সোনদণ্ড বললেন— "হ্যাঁ ভন্তে, রঙের ব্যাপারটা ছাড়া যেতে পারে। যদি বাকী চারটি গুণ তার মধ্যে থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত হতে পারে।"

বুদ্ধ বললেন— "বাকী চারটির মধ্যে কোনো একটি বাদ দিলেও কি বলা চলবে?"

উত্তর এল—"হ্যাঁ, তা হয়। মন্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনার কথাটি ত্যাগ করতে পারা যায়। যদি ব্যক্তি সদ্‌বংশজাত, সদাচারী এবং পণ্ডিত হয়, তাহলে সে ব্রাহ্মণ হতে পারে।"

বুদ্ধের সৌম্য শান্ত মুখে একটা হাসির আভা খেলে গেল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা আচার্য, যদি এই তিনটি গুণের মধ্যে কোনো একটি গুণকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে কি ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে?"

সোনদণ্ড একটু চিন্তা করে বললেন— "হ্যাঁ, তাহলে সদ্‌বংশজাত বা উঁচু জাতের ব্যাপারটা বাদ দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে।" সোনদণ্ড কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে শোরগোল পড়ে গেল। সবাই সোচ্চার হয়ে বলে উঠল— "আচার্য, আপনি ওকথা বলবেন না। আপনি বর্ণের প্রত্যাখ্যান করলেন, বেদের প্রত্যাখ্যান করলেন, জাতিরও প্রত্যাখ্যান করলেন। আর বাকী রইলটা কী? এভাবে তো আপনি বুদ্ধেরই কথার অনুমোদন করছেন যে জন্মগত বৈশিষ্ট্যই বড়ো নয়, গুণগত বৈশিষ্ট্যই বড়ো।"

সোনদণ্ড বড়োই সমস্যায় পড়লেন। এই সময় বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন— "আপনারা মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। যদি আপনাদের মধ্যে আচার্য সোনদণ্ডের চেয়ে পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ কেউ থেকে থাকেন— তাহলে তিনিই এগিয়ে আসুন। আর যদি সোনদণ্ডই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন, তাহলে তাঁকেই কথা বলতে দিন।"

বুদ্ধের মন্দ্রমধুর কণ্ঠস্বরে ব্রাহ্মণদের কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। সোনদণ্ড প্রথমদিকে কোলাহল হচ্ছে দেখে একটু দমে গিয়েছিলেন। তারপর ধীরে সুস্থে ভগবানের কথায় বুকে বল পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভগবানকে করজোড়ে নিবেদন করে তিনি বললেন— "ভন্তে, আপনি দাঁড়ান—আমি এদের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি—।"

সোনদণ্ডের সঙ্গে তাঁর ভাগনে অঙ্গদণ্ড এসেছিল। ছেলেটি যেমন সুন্দর, তেমনি গৌরবর্ণ

এবং শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবেও পরিচিত ছিল। তাকে দেখিয়ে সোনদণ্ড ব্রাহ্মণদের বললেন—

"আপনারা সবাই আমার ভাগনে অঙ্গদের সঙ্গে পরিচিত?"

সবাই সমস্বরে উত্তর দিল— "হ্যাঁ, আমরা সবাই ওকে চিনি।"

সোনদণ্ড বললেন— "আপনারা জানেন যে ব্রাহ্মণের যোগ্যতা-রূপে বর্ণিত পাঁচটি গুণের প্রতিটি ওর মধ্যে আছে। অঙ্গদ উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ সন্তান। আমাদের এই বিশাল সভায় একমাত্র তথাগত গৌতম বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ অঙ্গদের ন্যায় ফরসা নয়। শুধু তাই নয়, অঙ্গদ বেদপাঠী, মন্ত্রের জ্ঞাতা, বেদজ্ঞ এবং কবিও। ওর মা-বাবা দুজনেই অতি উচ্চবংশজাত। আপনারা একটা কথা বলুন — এত গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি অঙ্গদ হিংসা করে, চুরি করে, বেশ্যায় আসক্ত হয়, মিথ্যাকথা বলে, মদ খায়— তাহলে একবার বলুন তার গায়ের রঙেই বা কী লাভ, সদ্‌বংশে জন্মলাভেই বা কী লাভ, পড়াশুনা করে বেদজ্ঞ, মন্ত্রবিৎ হওয়াতেই বা কী লাভ আর উচ্চবংশের হলেই বা কী হবে?"

ব্রাহ্মণরা সবাই চুপ। সত্যিই এই জ্বলন্ত সত্যের কাছে প্রতিবাদের কোনো ভাষাই ছিল না তাঁদের কাছে।

বুদ্ধ হাসিমুখে কথাটি পূর্ণ অনুমোদন করে বললেন—"হে আচার্য! যদি এই দুটি কথার কোনো একটিও বাদ যায় তাহলে সে ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত হবে কি?"

সোনদণ্ড বললেন— "না হে তথাগত! শীলের থেকে প্রজ্ঞা তৈরি আর প্রজ্ঞার থেকে শীল বা সদাচার গড়ে ওঠে। দুটিই একের উপর অন্যটি অশ্রিত। যেখানে সদাচার সেখানেই শীল রয়েছে, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানেই শীল রয়েছে তবুও পৃথিবীতে জ্ঞান একটু থাকলেও চলে কিন্তু সদাচার জীবনে চলার পথে বিশেষ জরুরি।" ......

এভাবেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই জাতির,বর্ণের তুচ্ছতাকে তুলে ধরে জন্মের থেকেও গুণকে বড়ো আসন প্রদান করেছিলেন।

# মহান জনবাদী বুদ্ধ

বুদ্ধ ভারতের সবচেয়ে বড়ো জনবাদী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কোনো ঈশ্বর বা দিব্য শক্তির উপর বিশ্বাস করতেন না বা কোনো অতীন্দ্রিয় বস্তুর দ্বারা জগতের কল্যাণের আশাও করতেন না। বহুজনের হিতকেই তিনি একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরও লোকহিতার্থেই পরিব্রাজন করতে বলতেন। সে যুগে বৈশালী রাজ্যের এমন কিছু গুণ ছিল যেগুলি জনগণের স্বার্থের অনুকূল ছিল। তাই বুদ্ধ বৈশালীকে একটু বেশি স্নেহ করতেন। বুদ্ধের সংঘও বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক মতেই গঠিত ছিল। বহুমত বা ভোটে কে জয়ী হয়েছে সেটা জানবার জন্যে পেনসিলের মতো দেখতে দুটো আলাদা রঙের কাঠের শলাকা ব্যবহার করা হত। প্রাচীনকালে ভোট দেওয়ার নাম ছিল ছন্দ। ছন্দের শব্দগত অর্থ ইচ্ছা বা স্বচ্ছন্দ বলা চলে। 'স্বচ্ছন্দ' শব্দটি থেকে 'চন্দা' বা চাঁদা শব্দটি জন্ম নিয়েছে। —যার মানে হল 'স্বেচ্ছাপূর্বক দান' অট্‌ঠকথাতে কীভাবে গরিষ্ঠ মত পাওয়া যায়, তার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে বুদ্ধ বলেছেন—

"আমি স্পষ্ট করে বলছি যে— এই প্রকার কার্যপ্রণালীর দ্বারাই সর্বসম্মত মত ব্যক্ত হবে। পাঁচটি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষুকে শলাকা বিতরক বা বিতরণকারী বলে মানা উচিত।" বুদ্ধ বলছেন, "(১) যিনি নিজের রুচি অনুসারে গমন করেন না, (২) যিনি হিংসা বা দ্বেষ দ্বারা কোনো কর্ম করেন না (৩) আবার মোহগ্রস্তও না হন (৪) ভয়ে ভীত না হন, (৫) এমনও যেন না হয় যে মনের ভেতরে আঁকড়ে রাখা কোনো পূর্বাগ্রহকেই প্রধান ভেবে সে পথেই এগিয়ে যান। 'যদ্‌য়সিক' কাকে বলে? এটা সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে কাজ করা যায়, যা লোকহিতকর তার অনুমোদন করা যায় এবং পারস্পরিক ঝগড়া শান্ত হয়ে যায়।"

ভোট দেওয়া বা মতদানের ব্যাপারে যে প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি পাওয়া যায় তা এই রূপ— দুটি শলাকা নিয়ে একটিতে রঙিন এবং অন্যটিতে কোনো রং না লাগিয়ে এক একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে শলাকা বিতরণকারী কানে কানে বলবেন যে—'এটা অমুক পক্ষের শলাকা (বা প্রতীকচিহ্ন)।' সুতরাং যেটা তোমার পছন্দ তুমি সেটা গ্রহণ করো। শলাকা গ্রহণ করার পর বলা উচিত এটি সম্পূর্ণ গোপন রাখবে। এভাবেই এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে জীবনের ক্ষেত্রে এবং গণতান্ত্রিক নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে সংঘে ব্যবহৃত হত।

বুদ্ধ চিরদিন ব্যক্তির চেয়ে সমাজকে বেশি মূল্য দিতেন। যখন ঘটনাচক্রে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো একটিকে চয়ন করতে হয়েছে, তখন তিনি বিশেষভাবেই সমাজের পক্ষ নিয়েছেন (মজ্‌ঝিম নিকায়, ৩/৪/১২)

একবার তথাগত বুদ্ধ শাক্যদের দেশ কপিলবস্তুতে ন্যগ্রোধারামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী, একদিন ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনিই ভগবান বুদ্ধের গর্ভধারিণীর দেহত্যাগের পর নিজে মায়ের মতো বুদ্ধকে লালন পালন করেছিলেন। নিজের বুকের দুধ খাইয়ে তিনি বুদ্ধকে বড়ো করে তোলেন। আজ এতদিন পরে যখন বুদ্ধ কপিলবস্তুতে

এসেছেন, সেই উপলক্ষ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী একটি কাঁথা নিজ হাতে তৈরি করে বুদ্ধের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বুদ্ধকে যথাযথ অভিবাদন করে তাঁকে কাঁথাটি দিতে চাইলেন। বুদ্ধ মৃদু হেসে বলেন—"মা, আপনি যদি এটি সংঘকে দান করেন, তাহলে সবথেকে ভালো হয়। যা সংঘে দেওয়া হয় তা সবার ব্যবহারে আসে। বস্তুর সার্থকতা এতেই যে নির্বিশেষে সবাই সেটা ব্যবহার করুক। কারও কোনো বিশেষাধিকার থাকবে না।"

কিন্তু গৌতমী বুদ্ধের কথায় কর্ণপাত না করে বার বার অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যাতে বুদ্ধ তাঁর হাতে তৈরি কাঁথাটি গ্রহণ করেন।

গৌতমীকে এতবার অনুনয় অনুরোধ করতে দেখে আনন্দ এগিয়ে এসে বুদ্ধকে নিবেদন করলেন—"হে তথাগত, আমিও নিবেদন করছি, আপনি মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রদত্ত এই অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত কাঁথাটি গ্রহণ করুন। হে তথাগত, গৌতমী কোনো সাধারণ মহিলা নন। গৌতমী ভগবানের সম্পর্কে মাসি হলেও তিনি মায়ের ন্যায় পূজনীয়া। আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বুকের বুধ খাইয়ে ভগবানকে মানুষ করেছেন। ইনি অপত্যস্নেহে ভগবানের শৈশবের ভার না নিলে আমরা আজকের তথাগতকে পেতান না। অপরদিকে ভগবান নিজেও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মহোপকারক। ভগবানের দিব্য সংস্পর্শে এসে গৌতমী মাতা বিশেষভাবে শুদ্ধ-সাত্ত্বিক জীবনযাপন করছেন, যাবতীয় দিব্য জীবনের উপযোগী আচার ব্যবহার, শুদ্ধ সাত্ত্বিকতা তাঁর হৃদয়ে, মনে, আচরণে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। গৌতমী মাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দাত্রী আর কেউ নেই। অতএব, আমার নিবেদন, আপনি এই কাঁথাটি গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধ এবার গম্ভীর হলেন। তিনি ধীর, শান্ত কণ্ঠে বললেন— "আনন্দ, সত্যটা এতটাই কঠোর বাস্তব যে তা তোমার মন মানতে চাইবে না। ব্যক্তিগত দান যত উচ্চ পাত্রই করুক না কেন — সেটা ব্যক্তিগতই সর্বজনীন নয়। ব্যক্তিগত দান স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বৈরতন্ত্রের বিষাক্ত বীজ বপন করে। সে ব্যক্তি মাতৃসমাই হোন আর সে লোকটি বুদ্ধই হোক দাতা-গ্রহীতা কেউই দোষমুক্ত নয়। যা সবার, তা সংঘের, তা মানবজাতির। আজ নয়, তবে আগামী সুদূর ভবিষ্যতে আমি জানি সংঘ অবনতির পথে যাবে। তখন চীবর পরিহিত বহু ব্যক্তিই ভিক্ষু বলে পরিচিত হলেও তাঁরা আদৌ ভিক্ষুপদের উপযোগী বলে গণ্য হবেন না। এক্ষেত্রেও আমি ব্যক্তিগত দানকে সমর্থন করব না। সংঘের জন্যে দান, ব্যক্তিগত দানের চেয়ে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এ ব্যাপারে কোনোরূপ অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ শুনতেই রাজি নই।"

বুদ্ধের বক্তব্য শুনলেই আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি মনে প্রাণে স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী এবং গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংঘেও তিনি আর্থিক সাম্যবাদ প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেই নিয়ম মেনে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা নিজেদের দেহ ঢাকবার জন্য কাপড় ফেটে ছিঁড়ে গেলে সেটি সেলাই করবার জন্য একটি সূঁচ এবং একটি জলের পাত্র ব্যক্তিগতভাবে রাখতে পারবে, এগুলি ছাড়া বাকী যাবতীয় দ্রব্য সংঘের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। কিন্তু বুদ্ধের এই আর্থিক সম্যবাদ বেশিদিন বজায় রাখা যায়নি। বৈশালীর দ্বিতীয় বৌদ্ধ পরিষদীয় সভায় বুদ্ধের এই আর্থিক সম্যবাদের নিয়ম মানা হয়েছিল কিন্তু তারপরেই নিয়মটির প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। অতঃপর নিয়মটি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

বৈশালী গণরাজ্যে যে সাতটি প্রধান প্রশাসনিক গুণ ছিল সেগুলি সবই বুদ্ধের অনুমোদিত ছিল। বুদ্ধ বিশেষভাবে বৈশালীকে সেই কারণে পছন্দ করতেন।

বৈশালীর আর একটি বড়ো ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে এখানেই ভিক্ষুণী সংঘের প্রথম স্থাপনা হয়। বুদ্ধের ধাত্রীমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর একান্ত সাধ ছিল যে তিনি সন্ন্যাসিনীর (ভিক্ষুণীর) ব্রত গ্রহণ করবেন। তার আগে কেউ বুদ্ধের সংঘে ভিক্ষুণী হয়নি। বুদ্ধ কোনোভাবেই মত দেননি এ ব্যাপারে। বুদ্ধ কপিলবস্তু থেকে বৈশালী চলে আসার পর, বুদ্ধের কথায় হতাশ না হয়ে গৌতমী অন্যান্য শাক্য স্ত্রীদের সঙ্গে ছোটো করে চুলগুলি ছেঁটে, গৈরিক বস্ত্র পরে পায়ে হেঁটে বৈশালী পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘ বন্ধুর পথ পায়ে হেঁটে আসার জন্য তাঁদের পা ফুলে গিয়েছিল, সমস্ত শরীর পথের ধূলায় ধূসর হয়ে গিয়েছিল। দুই চোখে জলের ধারা নিয়ে অসহায়ের মতো গৌতমী ফাটকের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আনন্দ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে দেখে ভীষণ কষ্ট পেলেন এবং কাছে গিয়ে কারণ জানতে চাইলেন। গৌতমী বললেন যে, তথাগত স্ত্রীদের ভিক্ষুণী হবার সম্ভাবনা নেই বলে দিয়েছেন। আনন্দের মনে তখন এদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি। তিনি গৌতমীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আপনি চিন্তা করবেন না মা। আমি ভগবানকে গিয়ে এ ব্যাপারে বলছি।"

আনন্দ, ভগবান বুদ্ধ যেখানে ছিলেন, সেখানে গেলেন। বুদ্ধকে অভিবাদন করে তাঁর পাশে বসে অনুনয়ের সুরে বলে উঠলেন —

"ভন্তে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ফাটকের বাইরে অসহায়ের মতো ধুলোমাখা শরীরে, খালি পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। তিনি অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে এতদূর পায়ে হেঁটে এসেছেন শুধু আপনার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে আপনি গৌতমী মাতাকে সন্ন্যাস দিন।"

বুদ্ধ বললেন—"আনন্দ, এ ব্যাপারে তোমার একান্ত ইচ্ছাকে এখন বাদ দাও।"

কিন্তু আনন্দ বার বার বুদ্ধকে অনুনয় করতে লাগলেন, মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে সন্ন্যাস দেওয়ার জন্য। বুদ্ধ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে গৃহত্যাগ করে বাইরে বাইরে পরিব্রাজন করে বেড়ানোর জন্য স্ত্রীদের প্রব্রজ্যার আজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

আনন্দ তখন প্রশ্ন করলেন—"নারীরা যদি সঠিকভাবে নীতি ও ধর্মের পথে চলে তাহলে কি তাঁরা অর্হৎ-ফল এবং অন্যান্য উচ্চ ফল লাভ করতে পারেন?"

বুদ্ধ একবাক্যে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তাঁরা করতে পারেন।"

আনন্দ বললেন—"ভন্তে, মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং অন্যান্য নারীরা কী বিশ্বের থেকে আলাদা। তাঁদের মুক্তি হওয়াটা, প্রব্রজ্যার দ্বারা সংসারের গোলকধাঁধা থেকে বাইরে আসাটাও তো জরুরি। তার শুরুটা, আপনি করুন না প্রভু!"

বুদ্ধ বললেন—"তুমি যখন সংঘের দৃষ্টিভঙ্গিতেই যাবতীয় বিষয় দেখছ, সেক্ষেত্রে আমার আর কিছু বলার নেই। যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চান সেক্ষেত্রে তাঁকে আটটি মহাব্রত বা প্রধান ধর্মকে পালন করতে হবে।"

আনন্দ আটটি প্রধান ধর্মের কথা জানতে চাইলে বুদ্ধ বললেন—

১) ভিক্ষুণীরা যত বয়স্কাই হোন না কেন, নবদীক্ষিত ভিক্ষুদের তাঁরা সবসময় হাত জোড় করে অভিবাদন জানাবেন। সারা জীবন তাঁরা এই নিয়মটি পালন করবেন।

২) ভিক্ষুর কাছে তাঁরা ধর্মকথা শ্রবণ করবেন।

৩) প্রতি মাসের মাঝামাঝি ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুসংঘের কাছে পথপ্রদর্শন চাইবেন।

৪) বর্ষাবাস হয়ে যাওয়ার পর ভিক্ষুণীদেরও প্রত্যেকের ন্যায় একে অন্যের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৫) যে ভিক্ষুণী গুরুপদে বসবেন, তাঁকে সবাই মেনে চলবে (ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী সংঘ দুটিই)।

৬) কোনোদিন কোনো সতীর্থা ভিক্ষুণীকে কটুকথা, গালিগালাজ করা চলবে না।

৭) ভিক্ষুরা তাঁদের বলে দেওয়া নিয়মে চলবেন। আর ভিক্ষুণীরা নিজেদের নিয়ম সঠিকভাবে পালনে সচেষ্ট হবেন।

৮) কিন্তু ভিক্ষুরা যদি ভিক্ষুণীদের আচরণে স্খলন দেখেন অবশ্যই সে কথা বলবেন।

গৌতমী মাতা যদি এই আটটি গুণকে আজীবন গ্রহণ করতে রাজি থাকেন, তাহলে তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

আনন্দ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে কথাগুলি বলাতে তিনি এককথায় রাজি হলেন— এবং ভিক্ষুণী রূপে বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হলেন।

এভাবেই বুদ্ধ প্রতি পদে জনবাদী, লোকহিতকর কাজে এগিয়ে সাম্যবাদের একটি প্রাচীন উদাহরণ পেশ করেছিলেন।

# দার্শনিক সিদ্ধান্ত

## ১ শীল

শীলের অর্থ হল আচার। আচার অনুগামী কার্যকলাপকে শীলের অন্তর্গত বলে অভিহিত করা হয়। শীল তত্ত্বের উপরে বুদ্ধ সবচেয়ে বেশি জোর দিতেন। সাধারণ লোকে তাই এ ব্যাপারে বুঝতে ভুল করে যে বুদ্ধ বোধহয় শুধু শীলের উপরেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এটা বোঝা উচিত যে শীল ছাড়া বড়ো বড়ো সিদ্ধান্তগুলিকে আওড়ালেই হবে না— আচরণগত স্তরে সেগুলি প্রতিফলিতও করতে হবে। শীল হল, নিজের জীবন এবং কর্মের দ্বারা ব্যক্তি এবং সামাজিক স্তরে উত্থানের প্রচেষ্টা। শীল হোক, সমাধি হোক, বা প্রজ্ঞা , বুদ্ধ অতিরিক্ত কিছু করার উপর সবসময় নিষেধের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই প্রথম উপদেশ দেওয়ার সময়, সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তনের কালে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন—"ভিক্ষুগণ, একেবারে অনার্যদের ন্যায় কামবাসনায় লিপ্ত হতে নেই, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের দ্বারা নিজের জীবনকে কলুষতায় ভরে তুলতে নেই। আবার কঠোর তপস্যা করে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করে, নিজেকে চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যে নিয়ে যেতে নেই। কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করতে নেই। আমি মধ্যম মার্গের পরম সত্য জানতে পেরেছি, এই মধ্যম মার্গই জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করে, পরিপূর্ণ জ্ঞান আনে এবং সবশেষে নির্বাণ লাভ করায়। যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমি দেখিয়েছি সেগুলি হল— সঠিক দৃষ্টি, সঠিক সংকল্প, সঠিক বচন, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবিকা, সঠিক পরিশ্রম, সঠিক স্মৃতি এবং সঠিক সমাধি।"

যে পাঁচ ধরনের শীল এবং আচার (পঞ্চশীল) বুদ্ধ সবার জন্যে বলতে চেয়েছেন সেগুলি হল— (১) হিংসা না করা, (২) চুরি না করা (৩) যৌন দুরাচার না করা, (৪) মিথ্যাকথা না বলা, (৫) নেশার দ্রব্য কোনোভাবেই সেবন না করা।

আচারগত নিয়মের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বুদ্ধ কেবলমাত্র ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রেই কিছু আচারের কথা বলেছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযমের উপরেও বুদ্ধ বেশ জোর দিয়েছেন। মন, বাক্য এবং কর্মে যথাযথ সংযম আনাটাই প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম বলা হচ্ছে—

"সর্ব পাপস্য অকরণং কুশলস্যোপসম্পদা ।
স্বচিত্তপর্যবদপনং এতদ্ বুদ্ধানুশাসনম্ ॥"

(যাবতীয় পাপকর্ম ত্যাগ করা, পুণ্যের সংগ্রহ করা, চিত্তকে শুদ্ধ করা, এটাই বুদ্ধের উপদেশ।)

পৃথিবীতে ভালো কাজ কী? মন্দ কাজই বা কী? ঈশ্বর বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এতে কোনো বিশেষ অসুবিধা নেই। তাদের মতে ঈশ্বরীয় বইপত্রে যা করা উচিত বলে বলা হয়েছে, পুণ্যের কাজ বলে বলা হয়েছে— সেটাকেই পূণ্য কর্ম রূপে ভাবা উচিত। যার নিষেধ করা হয়েছে— তা পাপ। কিন্তু বুদ্ধ কোনোরূপ ঈশ্বরকে মানতেন না, বা ঈশ্বরের বাণী সম্বলিত কোনো গ্রন্থকে তিনি ঈশ্বরপ্রতিম বলে আখ্যা দিতেন না। নিজের কথাকেও তিনি ঈশ্বরীয় বাণী বলে

মানতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনিও তাঁর উপদেশগুলি অন্ধের ন্যায় মানতে দিতে চাননি। সবসময় বলে এসেছেন— বুদ্ধি এবং অনুভবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবেই সেটা গ্রহণ করবে। বুদ্ধ বললেন—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর। সবার কল্যাণের জন্য, জগতের মঙ্গলার্থে নিজেদের সমর্পিত কর।

বুদ্ধ ভালোভাবেই জানতেন—যে মানুষের একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। নিয়মের পালন মানুষ তখনই করতে সক্ষম হয় যদি সেগুলো শ্বাসরোধকারী না হয়ে দাঁড়ায়। দেশে সুখ শান্তি স্থাপিত করার জন্যে তিনি দণ্ডকে অতটা মূল্য দেননি। তিনি জোর দিয়েছিলেন অনিবার্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সুরক্ষিত করার ব্যাপারে। এ ব্যাপারে একটি কথাসূত্রের উপস্থাপনা (কুটদন্ত-সুত্ত, দীঘনিকায়, ১/৫) করেছেন তিনি—

"প্রাচীনকালে বহু প্রতিপত্তিশালী, ঐশ্বর্যবান এবং সাম্রাজ্যবিজেতা মহাবিজিত নামক এক রাজা ছিলেন। একবার তিনি মনে মনে ভাবলেন যে— মানুষের ভোগ্যবস্তু আমার কাছে বিপুল পরিমাণে আছে। এই বিশাল পৃথিবীমণ্ডল আমি শাসন করি। যদি আমি এমন যজ্ঞ করি যাতে চিরকাল আমার কল্যাণ সাধিত হবে তাহলে কেমন হয়? এ ব্যাপারে তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ডেকে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সব কথা শুনে পুরোহিত বললেন—'মহারাজ, আপনি অনেক দোষে দোষী। আপনার দেশ নিষ্কণ্টক নয়, এখানে গ্রামে গঞ্জে চুরি-ডাকাতি, লুটপাট লেগেই আছে। যে জনগণ এমনিতেই উৎপীড়িত, আপনি আবার সেই জনগণের উপর করের বোঝা বসিয়ে নিজে পাপের ভাগী হচ্ছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন— কঠোর শাসন করে দেশ থেকে এই লুটপাট, রাহাজানি বন্ধ করবেন। হয়তো প্রচণ্ড কঠোরতার জন্যে সাময়িক কিছুটা ঠান্ডা হবে সমাজ, কিন্তু এদের মধ্যে যারা বেঁচে যাবে, কিছুদিন পরে আবার তারা লুটপাট করতে শুরু করবে। তাই আমি বলি আপনার এরূপ কাজ করা উচিত নয়।"

রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন—"এর থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী?"

পুরোহিত বললেন—"প্রয়োজনীয় জনকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরুন—জনতার পাশে এসে দাঁড়ান। যারা আপনার রাজ্যে কৃষি, গো-পালন করতে চায় তাদের বীজ এবং প্রয়োজনীয় কৃষিজ বস্তুগুলি বিতরণ করুন। যারা বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক, তাদের পুঁজি দিয়ে সাহায্য করুন, যারা আপনার রাজ্যপাটে চাকরি করছে তাদের ভালোমতো মাইনের ব্যবস্থা করুন। এতে দেশের জনতা আনন্দিত হয়ে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে, ফলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে। দেশে সুখ শান্তি বাড়বে, জনগণের মুখে আপনি আপনার নামের জয়ধ্বনি শুনতে পাবেন।"

একথা শুনে, রাজা তখন রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য যা প্রয়োজন তাই করলেন। ফলে, রাজ্য নিষ্কণ্টক হল এবং জনতার মুখে হাসি ফুটল।

## ২ সমাধি

বুদ্ধকে তাঁর জীবদ্দশায় 'মহান যোগী' বলে অভিহিত করা হত। আদি শঙ্করাচার্যও বুদ্ধকে 'যোগীনাং চক্রবর্তী' বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধ তাঁর বিভিন্ন উপদেশের দ্বারা যোগ-ধ্যানের

সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। পালিতে 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ' নামে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ এই বিষয়ের উপরেই লিখিত হয়েছে। সব কালেই এমন কয়েকজন ভিক্ষু হয়েছেন যাঁরা গভীর অরণ্যে নির্জনে বসবাস করে ধ্যান জপের অভ্যাস করতেন। ধ্যান মূলত চারটি প্রকারের বলে বলা হয়েছে। এগুলি চিত্তের বিভিন্ন স্থিতি বা ভূমি, যেখানে মনকে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। এদেরকে ক্রমশ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যান বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি ধ্যানেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিত্ত বাহ্যিক বিষয়গুলি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায় এবং একটি বিষয়ে একাগ্র হয়ে যায়। এই প্রথম স্তরের ধ্যানে মনস্তরে বিভিন্ন বিচার প্রবাহ এবং তর্ক বিতর্কের রাশি একত্রিত হতে থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে এই বুদ্ধির ওঠাপড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মন শান্ত হয়ে, চিত্তের একাগ্রতা স্থাপিত হয়। অবস্থাটা অত্যন্ত সুখকর এবং প্রীতিকর হয় সাধকের পক্ষে। তৃতীয় ধ্যানে মন প্রীতিবোধকেও উপেক্ষা করতে শুরু করে—কিন্তু এস্থানে অনুভূতি তখনও সজাগ থাকে। এমন অবস্থায় দেহ থেকে এক প্রকার অব্যক্ত সুখবোধ হতে থাকে সাধকের। চতুর্থ ধ্যানে মন বিলুপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ বা শোক, তাপের বাইরে, এক অখণ্ড পরিশুদ্ধ চিদানন্দের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় সাধক তখন অবস্থান করে।

এগুলিই ধ্যানের সর্বোচ্চ ভূমি বলে কথিত। এগুলি ছাড়া অন্যান্য যৌগিক ভাবনার বর্ণনাও আমরা পাই যার দ্বারা যোগের প্রেমিকরা বিশেষভাবে লাভান্বিত হন। সমাধির ক্রিয়াগুলি ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং তাদের অর্থও তখন স্পষ্ট হয়।

### ৩ প্রজ্ঞা

প্রজ্ঞার অর্থ দর্শন বা গম্ভীর জ্ঞান। বুদ্ধ এবং সর্বকালের সর্বদেশের বৌদ্ধ বিচারকরা প্রজ্ঞার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাই বুদ্ধকে যাঁরা কেবল আচার এবং নীতির প্রচারক বলে জোর দিতে চান, তাঁরা বাস্তবিকতা থেকে বহুদূরে রয়েছেন। বুদ্ধের প্রায় সাতশো বছর পরে জন্মগ্রহণ করা মহান দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর যাবতীয় দর্শনের মূলে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ-কেই মাথার মুকুট বলে মেনে নিয়েছিলেন। মধ্যমা প্রতিপদের বিচারকেও তিনি শাক্যমুনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের আলোকে প্রকাশ করেছেন।

**প্রতীত্যসমুৎপাদ**— প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ স্পষ্ট করে বোঝাতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন— 'অস্মিন্ সতি ইদং ভবতি'-এর পরে এটা হয়ে থাকে। এর মানে যাবতীয় বস্তুই অনিত্য, এই মৌলিক সিদ্ধান্তকেই বোঝায়। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ দর্শন অনিত্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা কোনো বস্তুকেই বাস্তবিক বলে স্বীকার করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটির অনিত্যতা প্রমাণিত না হয়। পরবর্তী স্তরে এটা আরও পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে যে—'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং' অর্থাৎ যা কিছু বাস্তবিক, তাই ক্ষণস্থায়ী। সাধারণত প্রায় সব দর্শনেই বাহ্যিক বস্তুগুলিকে অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী বলা হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধ বাইরের স্থূল জৎটাকেই শুধু অনিত্য বলেননি —অন্তরের সূক্ষ্ম জগৎটাকেও তিনি ক্ষণস্থায়ী বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের সময়কালের কিছু পূর্বে উপনিষদের দার্শনিকদের সময়কাল ছিল। প্রবাহণ, উদ্দালক, যাজ্ঞবল্কের ন্যায় ঋষিরা তাঁদের তত্ত্বের দ্বারা লোকের মনে এই বিশ্বাস আনয়ন করেছিলেন যে ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তনশীল গ্রাহ্য জগতের ভেতর নিত্য, কূটস্থ এবং অবিচল একটি সূক্ষ্ম বস্তু বর্তমান

রয়েছে। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটিকে তাঁরা আত্মা বলে অভিহিত করেছেন এবং সেই নিত্য, নির্বিকার তত্ত্বের বা আত্মার প্রাপ্তিকেই তাঁরা চরম উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেছেন। উপনিষদের এই আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদের অনুগামীদের সংখ্যা দেশে কিছু কম নেই। দেশের বাইরেও এই আত্মবাদ-ব্রহ্মবাদের প্রতিপাদক তত্ত্ব বেদান্তের অনুগামী বর্তমান রয়েছেন। সত্যিই এটা বেশ বড়ো একটা তত্ত্ব যেটাকে বুদ্ধ তাঁর অনিত্যতাবাদের দ্বারা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। উপনিষদের 'আত্মবাদ' তত্ত্বের উপর বুদ্ধ সবচেয়ে বেশি প্রহার করতে চেয়েছেন। বেদান্ত সৎ-চিৎ এবং আনন্দের ঘোষণা করেছে এবং বুদ্ধ অসৎ-অচিৎ এবং অন্ (না অর্থে)-আনন্দের ঘোষণা করেছেন। এর জন্যে তিনি অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মের শাব্দিক প্রয়োগ করেছেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বুদ্ধ উপনিষদের মূল সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। এটা বড়োই আশ্চর্যের কথা যে আজকাল বহু লেখক এদুটিকে সমন্বয় করে বুদ্ধকে উপনিষদের সিদ্ধান্তের প্রবক্তা বলে প্রমাণিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

বুদ্ধের 'অনিত্য-দর্শন' বা ক্ষণিকবাদ ভারতে প্রগতিশীল দর্শনের প্রধান প্রেরণা স্রোত রূপে কাজ করেছে। এই সিদ্ধান্তের কথা মেনে নিলে একাধারে ঈশ্বর এবং আত্মার বন্ধনের থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং নিয়তির ফাঁদ থেকেও মানুষ মুক্ত হতে পারে। পৃথিবীতে যাবতীয় বস্তু তার সৃষ্টির মুহূর্তে, ধ্বংসের ক্ষণকেও টেনে আনছে। একথাটা জেনেই বুদ্ধ সারতত্ত্ব রূপে প্রিয়জনের বিয়োগ এবং অপ্রিয় যোগাযোগে দুঃখিত না হয়ে এদের প্রতি চিন্তাকেও অস্থায়ী বলে গণ্য করেছেন। উপেক্ষা করে বুদ্ধ এই চিন্তার অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন — অন্যদেরও সেই একই কথা শুনিয়েছেন। এই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল স্থিতি নিয়ে নিরাশ হবার কারণও বুদ্ধ দেখেন না, কারণ, পরিবর্তনের ফলে অনুকূল পরিবেশেরও সৃষ্টি হতে পারে — সে নিজের চেষ্টায় আরও অনেক বেশি উন্নতি করতে পারে।

ক্ষণিকবাদ অনুসারে 'কারণ' ক্ষণিক। যে সময় কার্য উৎপন্ন হয়, তার পূর্বেই 'কারণ' গত সত্তাটিই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কার্য-কারণের কী সম্বন্ধ হতে পারে সেটা বলার জন্যেই বুদ্ধ প্রতিত্যসমুৎপদের পরিভাষা গড়ে তোলেন। অর্থাৎ একটির প্রতীত্য (নষ্ট) হলে দ্বিতীয়টির উৎপত্তি হয়ে থাকে। এদের সম্বন্ধ অনুসারে কারণের পর কার্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। বীজ নষ্ট হয়ে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়ে থাকে, এটা সবাই জানে, কিন্তু বুদ্ধ পরিবর্তনকে এত স্থূল চোখে দেখেন না। বাহ্যিক পরিবর্তনকে আমরা চোখে দেখতে পাই কিন্তু বুদ্ধের মতে একটি স্থূল পরিবর্তন, অসংখ্য সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মানুষ প্রতি মুহূর্তে মরছে আবার প্রতি মুহূর্তেই সে নবরূপ ধারণ করছে। পরিবর্তনটি এতই তীব্র যে প্রতি মুহূর্তের কালখণ্ডটাও আমরা ধরতে পারি না। প্রতিটি পরিবর্তনেই পূর্বগত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় যার জন্যে সমস্ত বিষয়টি একটি অখণ্ড প্রবাহ বলে মনে হয়।

বুদ্ধ চেতনাকে স্বীকার করেন এবং চেতনা ও চেতনকে একই বলে থাকেন। গুণ এবং গুণীর ভেদ বৌদ্ধ দর্শনে নেই। বুদ্ধ তত্ত্বকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এদের পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়ে থাকে। পাঁচটির মধ্যে রূপ ও বিজ্ঞান প্রধান এবং বাকী তিনটি রূপ এবং বিজ্ঞানের মিলিত ভিন্ন-ভিন্ন স্থিতি বা ক্রিয়া। স্থিতি এবং ক্রিয়ার মধ্যে কোনোপ্রকার ভেদ সে দেখে না, কারণ এমন কোনো স্থিতি নেই, যাতে ক্রিয়া নেই। নাশ এবং

উৎপত্তির অবিচ্ছিন্ন ধারা কোনো অবস্থাতেই থেমে থাকে না। রূপ হল ভৌত্তিক তত্ত্ব এবং বিজ্ঞান হল চেতনা। বাস্তবিকতার এই দুটি রূপ রয়েছে। দুটিতে একই সঙ্গে অবগাহন করা সম্ভব হয় না।

রূপ এবং বিজ্ঞানকে ক্ষণিক কিন্তু বাস্তবিক সত্তা বলে মানার জন্যে বুদ্ধকে দ্বৈতবাদী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু যে রূপে অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনকেও বস্তুর অন্তঃস্থলে তিনি স্বীকার করেন সেক্ষেত্রে দুটিতে কোনো ভেদ থাকে না। তাই, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দর্শনে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। সর্বাস্তিবাদীরা দুটিরই অস্তিত্ব মানতেন। সৌত্রান্তিক বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বকে মুখ্য বলে মানেন। বিজ্ঞানবাদী যোগাচার অন্তস্তত্ত্ব বা বিজ্ঞানকেই প্রধান তত্ত্ব বলে স্বীকার করতেন। এছাড়া শূন্যবাদীরা দুটির অস্তিত্বকেই সাপেক্ষ জেনে তাদের পারমার্থিক সত্তাকে অস্বীকার করে থাকেন। এগুলি বৌদ্ধ দর্শনের পরবর্তী বিকাশ রূপে স্বীকৃত। মধ্যমা-প্রতিপদ-মধ্যম মার্গের উপর বুদ্ধ হামেশাই জোর দিতেন। কর্মের ক্ষেত্রেও তিনি অতিবাদের রাস্তা ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অর্থাৎ একেবারে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনও নয়, আবার উন্মত্ত ভোগবিলাসও নয়—দুটির ক্ষেত্রেই তিনি বিরোধী ছিলেন এবং শান্ত স্বাভাবিক অন্তর্মুখী জীবনকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করতেন। দর্শনেও তিনি মধ্যমা প্রতিপদকে স্বীকার করতেন। একদিকে তিনি বৈদিক জড়বাদকে স্বীকার করেন না। বুদ্ধের সমসাময়িক যে জড়বাদী বিচারপদ্ধতি ভারতে ছিল সেটির দৃষ্টিতে জড়বস্তু বা মহাভূত থেকে ভিন্ন কোনো দ্বিতীয় বাস্তবিক বস্তু ছিল না। জড় বস্তুর থেকেই চেতনা উৎপন্ন হয়, যেমন গুড় বা অন্যান্য বস্তু থেকে মদ্যরস। অন্যদিকে ব্রহ্মবাদীরা ছিলেন, যাঁরা জড়ের সত্তাকে চৈতন্যের থেকে উৎপন্ন বলতেন। একটি আত্মবাদ, অন্যটি জড়বাদের রাস্তা। আত্মবাদকে পূর্ণ অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ জৈবিক জীবনের স্তরে অন্তর্নিহিত মানবিক চেতনাকেই মূলত গ্রহণ করেছেন যা কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ভর। রূপ ও বিজ্ঞান ভিন্ন এবং তাদের তিন ধরনের স্থিতিগুলিও সেই প্রকারের ভেদবোধ নিয়ে চলে। পাঁচটি স্কন্ধকে নিয়ে বিশ্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কার্য-থেকে কারণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানলে—তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে রূপের থেকেও বিলক্ষণ বিজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি।

তিনি উচ্ছেদবাদ অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে জীবনের সমাপ্তি—একথা মানেন না। কিন্তু তিনি এটা মানতে কসুর করছেন না যে প্রতিক্ষণে, প্রতিমুহূর্তে জীবন উৎপন্ন হয়ে আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জীবন একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা নয়, সেটি কোটি কোটি বিন্দুর সমূহ। প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতীক। এই শরীরেও জীবন-বিন্দু-প্রবাহ একে অন্যের এত কাছে থাকার জন্য মনে হয় জীবনটা বুঝি একই রয়েছে। কিন্তু বিন্দুর দ্বারা সৃষ্ট রেখা দেখলে যেমন বোঝা যায়, ঠিক তেমনই জীবনটা প্রতিটি মুহূর্তের সমন্বয়। কর্মের ফলদাতা অন্য কেউ নেই। মানুষের কর্ম অনুসারে সে ফল পায়। মানুষের ক্রিয়া অনুযায়ী তার জীবনও সেইরূপ গঠিত হয়। অনন্ত কাল ধরে অর্জিত ভালো ও মন্দ কর্মের ফলে যে মিশ্রিত সমূহ; সেটাই মানবের প্রধান পরিচয়। আত্মবাদীরা আত্মাকে স্থির জেনে ছেঁড়া কাপড়ের ন্যায় দেহ বদলানোর কথা বলেন এবং জড়বাদীরা মৃত্যুকেই এর সমাপ্তি বলে ইতি টেনেছেন। উচ্ছেদকে অস্বীকার করে

বুদ্ধ আত্মবাদকেও এখানে স্বীকার করেননি এবং জন্মান্তরের সঙ্গতির জন্যে জীবন বিন্দুর প্রবাহকে মেনে নিয়েছেন।

বুদ্ধ তাঁর অসামান্য প্রজ্ঞার দ্বারা তৎকালীন অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত, বিদ্বানদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। সারিপুত্ত এবং মৌদ্‌গল্যায়ন সে সময়ের পরম বিদ্বান এবং ব্রাহ্মণবাদী ধর্মশাস্ত্রে দুজনেই প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এদের পরে মহাকাত্যায়ন এবং মহাকাশ্যপ ছিলেন যাঁরা দুজনেই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। এরা সবাই বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তির ন্যায় মহান পণ্ডিত, তার্কিক এবং প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণদের বুদ্ধ তাঁর দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। এরাই পরবর্তীতে ভারতীয় দর্শনকে অনেক এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। ইউরোপে হেগেলের দর্শনকে পুষ্ট এবং বিকশিত বলা হয়ে থাকে। হেগেলের তেরোশো বছর আগে ভারতের হেগেল হয়েছিলেন ধর্মকীর্তি যাঁর দর্শনের পিছনে বুদ্ধের বিচারধারা বর্তমান রয়েছে। দিঙ্‌নাগ এবং ধর্মকীর্তি দুজনেই বুদ্ধের দর্শনকে স্পষ্ট করার জন্য 'প্রমাণবার্তিক' এবং 'প্রমাণসমুচ্চয়' লিখেছিলেন। 'প্রমাণসমুচ্চয়' মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। 'প্রমাণবার্তিক' বেশ কয়েকটি টীকা এবং ভাষ্যসহ মূল সংস্কৃতে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের চরম বিকাশকে জানতে হলে এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। বেদান্তই একমাত্র ভারতীয় দর্শনমতের প্রতিফলন নয়, তা ছাড়াও এক সুবিশাল অনাত্মবাদী, নাস্তিক্যবাদী ভারতীয় দর্শনের ধারা ভারতে প্রবাহিত ছিল। একদিকে যেমন ঈশ্বর, আত্মা, বেদ, বেদান্তের প্রবাহ চলেছে—অপরদিকে নাস্তিক দার্শনিক ধর্মকীর্তি যাবতীয় নিয়মকে নস্যাৎ করে বলেছিলেন—

"বেদপ্রামাণ্যং কস্যচিৎ কর্তৃবাদঃ স্নানে ধর্মেচ্ছা জাতিবাদাবলেপঃ
সন্তাপারম্ভঃ পাপহানায় চেতি ধ্বস্তপ্রজ্ঞানাং পঞ্চলিঙ্গানিজাড্যে।"

অর্থাৎ বেদের অকাট্য প্রমাণে বিশ্বাস করা, পৃথিবী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে এরূপ ভাবা, স্নান করলে ধর্ম রক্ষা হয় এরূপ ভাবা, জাতির অহংকার এবং পাপ দূর করার জন্য শরীরকে সন্তাপ দেওয়া অর্থাৎ উপবাস-তপস্যা করা এই পাঁচটি ক্রিয়াকলাপ মূর্খের লক্ষণ।

## বুদ্ধ দর্শন

বুদ্ধ এবং তাঁর প্রচারিত দর্শনপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আরও বাকী। বৌদ্ধ দর্শন অবলম্বন করলে মূলত ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে দিগ্‌ভ্রান্ত বোধ করে থাকে। কোন্ মহান সত্তাকে অবলম্বন করে তারা চলতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেছেন—"কারওর উপর নির্ভর করতে হবে না। নিজে স্বাবলম্বী হও (অত্তদীপা ভবথ অত্তসরণা)—তুমি নিজেই নিজের শরণে এসো। তুমিই তোমার স্বামী (অত্তা হি অত্তনো নাথো)। কোনো দেব বা মানুষের শরণাপন্ন হওয়াটা অপ্রয়োজনীয়। মানুষ নিজেই নিজের জোরে এগিয়ে যেতে পারে। যদি নিজের ভুলে নিজেকে ডুবতে হয়—তবুও কোনো পরোয়া নেই। কিন্তু অন্যের কথায় চলে, নিজের বিবেক-বিচার-বুদ্ধিকে আত্মবিক্রয়ের পথে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার মতো মূর্খতা আর হয় না।" বুদ্ধ সবসময় স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দিয়েছেন। স্বাবলম্বী ব্যক্তি অকর্মণ্য হতে পারে না। তাকে সবসময় নিজের কর্মের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। এই 'কর্ম-সিদ্ধান্ত' বৌদ্ধদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভগবানের শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমার সব কিছু উদ্ধার করবেন। এই কথাটিকে বৈষ্ণব ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম সর্বোপরি বলে প্রকাশ করে। প্রভু যিশুর কৃপা হলে তুমি নরক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবে। ইসলামেও, ইসলামি ধর্মের অনুসারে চললে পয়গম্বরের করুণায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হবে। এ ব্যাপারে বৌদ্ধ দর্শন বলে—ভালো বা মন্দ হাত থেকে ছুঁড়ে দেওয়া তীরের ন্যায়; কর্ম একবার সম্পাদিত হলে তার ফলাফলের উপর ব্যক্তির কোনো প্রকার অধিকার থাকে না— তাই কর্মের পূর্বে বিশেষ বিচার করা প্রয়োজন। জীবনকে প্রতিমুহূর্তে কর্ম পরিবর্তিত করতে পারে এবং করেও। প্রতিটি জীবন তার অনন্তকালের কর্মপ্রভাবের যোগফল। এই যোগের জন্যে কোনো বাইরের দেবতার প্রয়োজন হয় না। যেভাবে বহমান জলের প্রবাহে যদি রং মিশ্রিত করা হতে থাকে, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই জলটা সেই রঙে রঙিন হয়ে যেতে থাকে, জীবনের স্থিতিও সেই রকম ।

বৌদ্ধ দর্শন মতে পৃথিবীতে বস্তুদের বিনাশ হওয়ার জন্যে কোনো কারণের প্রয়োজন নেই। বিনা কারণে, বিনা হেতুতেই যাবতীয় পদার্থ তৈরি হয়ে পুনরায় নষ্ট হয়ে যায়। এটাই বৌদ্ধদের 'অহেতুক বিনাশের' সিদ্ধান্ত। কিন্তু সে কারণে আমরা তাঁদের অহেতুবাদী বলি না। বিনাশের জন্যে কোনো হেতুর প্রয়োজনীয়তা নেই কেন না বিনাশ অভাবরূপ। কিন্তু উৎপত্তির জন্যে একাধিক হেতুর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কোনো একটি বস্তুর উৎপত্তির জন্যে কোনো একটি কারণ বিশ্বে কোথাও দেখা যায় না। অনেকগুলি হেতু একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি কার্যকে উৎপন্ন করে থাকে। বৌদ্ধদের এই সিদ্ধান্তটিকে হেতুসামগ্রীবাদ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যারা অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের আপত্তি এটাই যে পৃথিবীর যে কোনো ছোটো বা বড়ো জিনিস নিয়ে নিন তার উৎপন্ন হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। যদি কার্য থেকে কারণের অনুমান করা যেতে পারে তাহলে সেটা

এটাই যে একটি কার্যের অনেক কারণ হতে পারে। অনেক কারণের মধ্যে কোনোটাকেই মূল্যহীন বলা যেতে পারে না, কেন না বাজারে দাম-দর করার সময় কোনো জিনিসের দাম যতই কম হোক না কেন, জিনিসটি যদি নিত্য প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে তার মূল্য অন্যান্য কারণগুলির সমানই হবে।

চরম অনিত্যতার সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য, কারণের দ্বিতীয় রূপ বলে পরিণত হয়। স্থিরবাদে ঘড়ার কারণস্বরূপ মাটিকে মানা হয় এবং সেই নরম মাটির তাল এবং ঘড়া, দুটিতেই 'মাটি' পরিবর্তিত হয়েও বর্তমান। এই ধরনের স্থূল বক্তব্যকেও বৌদ্ধরা ব্যবহারিক সত্যরূপে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু সেটা পরমার্থ সত্য নয়। পরমার্থগত দৃষ্টির আলোকে দেখলে মাটির তালের ভেতর সূক্ষ্ম পরমাণুগুলির ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে আলোকপাত করতে হবে। এগুলি প্রতিমুহূর্তেই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় দ্বিতীয় বস্তু তার স্থানে উৎপন্ন হয়। কার্য-কারণে কোনো বস্তু, একটি অপরটির জন্য স্থান করে দেয় না, বরং একটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে দ্বিতীয়টি উৎপন্ন হওয়ার জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয়। কারণ যে সময় ছিল, সে সময় কার্য ছিল না, কার্য যখন রূপায়িত হল, তখন কারণের বিনাশ হয়ে গেছে। এইরূপে বৌদ্ধ দর্শনে কার্য-কারণের নবতর ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

এভাবেই বুদ্ধ তাঁর দর্শনের মাধ্যমে একটি বৈপ্লবিক চিন্তাকে মাথায় রেখে পৃথিবীতে নব-ভাবনার উদ্ভব করলেন।

# অনিত্যবাদী

অনিত্যবাদী বৌদ্ধ ধর্ম ভালো বা মন্দ বস্তুটিকে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'-রূপী কষ্টিপাথরে কষে নির্ধারিত করে। আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বুদ্ধের বিচার ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েছে। যে এমনটা করত না, তাকে বুদ্ধ মূর্খ এবং ব্যর্থ, রাষ্ট্রের অন্নধ্বংসকারী বলে অভিহিত করতেন (মোঘংস রট্ঠপিণ্ডং ভুঞ্জতি)। বুদ্ধ সবসময় সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবার উপদেশ দিয়েছিলেন। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের তিনি আর্থিক সাম্যবাদ অনুসরণ নিয়ম করে দিয়েছিলেন। চীবর, ভিক্ষাপাত্র ইত্যাদি আটটি বস্তু ছাড়া যাবতীয় অন্যান্য বস্তুগুলি সংঘের সম্পত্তি বলে রক্ষিত হত। বুদ্ধের সময়ে যে ঘর বা জমি দান হিসেবে পাওয়া যেত— সেটি সংঘকেই দেওয়া হত। চার-পাঁচশো বছর ধরে এই প্রথা চলতে থাকে। শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্ট জন্মের দুশো বছর আগে যাবতীয় দান সংঘে জমা হত।

বুদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থারূপী লিচ্ছবীদের গণতন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। লিচ্ছবী গণতন্ত্রের ন্যায়প্রিয়তার উপর বুদ্ধের অগাধ বিশ্বাস ছিল। রাজতন্ত্রের চেয়ে যে গণতন্ত্র বুদ্ধের কাছে অধিক কাম্য ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধ রাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেছিলেন— "ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য লোকদের মধ্যে বৈষম্যের উৎপত্তি হয়েছিল। তারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করেছিল, একে অন্যের সম্পত্তি গুপ্ত বা অসৎ উপায়ে ছিনিয়ে নিতে শুরু করেছিল। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে করতে কালক্রমে তারা রাজা হয়ে দাঁড়ায়।"

বুদ্ধের সময়কালে দেশে আর্থিক এবং সামাজিক ভেদভাব বড়োই প্রবল ছিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি সংঘে এবং সর্বত্রই সামাজিক ভেদভাবের ভাবনাটিকে উন্মূল করতে চেয়েছিলেন। জাতিবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ যখন সোচ্চার হয়েছিলেন তার প্রভাব সমাজে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনি চণ্ডাল-সন্তানদের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ন্যায় দীক্ষিত করে বিশেষভাবে সামাজিক স্তরে উন্নীত করেছিলেন। এভাবে বৌদ্ধ ধর্ম, জাতি, দেশ এবং বর্ণকে লোপ করে সামাজিক উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল।

দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের নিজস্ব মৌলিক অবদান রয়েছে যা অবশ্যই অসাধারণ। মার্কসীয় দর্শন, বৌদ্ধ দর্শনপ্রণালীর খুবই কাছাকাছি। বৌদ্ধ দর্শনের ছাত্রের পক্ষে মার্কসীয় দর্শনপ্রণালী বোঝাটা সহজ হয়ে যায়। মার্কসীয় দর্শনে হেগেলীয় দর্শনের প্রভাব যথেষ্ট। হেগেলীয় দর্শনের অসঙ্গতিগুলি অপসারিত করে মার্কসীয় দর্শন বিকশিত হয়েছে। এভাবে হেগেলীয় দর্শনের অব্যবহারিকতাকে মার্কসবাদী দর্শনে ব্যবহারিক এবং জনকল্যাণের ভিত্তিতে উন্নত করে আরও বৈজ্ঞানিক এবং উপযোগী করে তোলা হল। হেগেল মনকে মুল মানতেন এবং জগৎকে তার থেকে উৎপন্ন বলতেন। মার্কস জড়পদার্থ বা ভৌতিক তত্ত্বকে মৌলিক মেনে এবং মন-কে তার থেকে উৎপন্ন বলে অভিহিত করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনও সেই অনিত্যের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যা আমাদের বিশেষভাবে এই দিকেই উদ্বুদ্ধ করে।

এই অনিত্যবাদের পূর্ণ বিকাশ শূন্যবাদেরও পূর্ণ বিকাশ নিয়ে উঠে আসে। কার্য-কারণের সিদ্ধান্ত তার প্রাচীন পরিকাঠামোকে ত্যাগ করানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতীত্যসমুৎপাদ কার্য-কারণের মূলগত সিদ্ধান্তের স্থান নিচ্ছে। এর আগে যেখানে একাধিক কার্যগত উৎপত্তি মানা হত, সেখানে বৌদ্ধ দর্শনের বক্তব্য ছিল যে, কোনো বস্তু একটিমাত্র কারণ থেকে জন্মায় না—অনেকগুলি কারণ মিলে একটি বস্তুর নির্মাণে সাহায্য করে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এগুলিকে 'হেতুসামগ্রীবাদ' বা 'কারণ-সমূহবাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মকীর্তি বলেছেন—'ন চৈক একং একস্মাদ সামগ্রয়া সর্বসগুবঃ' (একটির থেকে একটি একটি বস্তু নয় বরং সমূহে সবকিছুর উৎপত্তি হয়ে থাকে)। অনেকগুলি হেতু বা কারণ যখন একত্রিত হয়, তখন একটি কার্যগত পদার্থের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণগুলির একটিও অনুপস্থিত থাকলে কার্য উৎপন্ন হতে পারে না। কার্য বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে কারণ থেকে নিতান্তই আলাদা, অর্থাৎ কারণ থেকে গুণাত্মক পরিবর্তন হয়ে কার্য উৎপন্ন হয় এবং এই অভিনব কার্যটি, অর্থাৎ গুণাত্মক পরিবর্তন ততক্ষণ সাধিত হয় না, যতক্ষণ যাবতীয় কারণগুলি একত্রিত না হয়।

বিশ্বকে এই রূপে দেখতে গিয়ে বৌদ্ধরা সৎ এবং অসৎ বস্তুর ব্যাখ্যা করেছেন। আগের চিন্তাবিদরা খুব সহজেই বলে দিতেন—যা নিত্য, কূটস্থ, নির্বিকার তা সৎ এবং যা অনিত্য, অকূটস্থ এবং সবিকার তাই অসৎ। বৌদ্ধ দর্শনে এমন সৎবস্তুর জন্যে কোনো স্থান নেই। সর্বঅনিত্যতাবাদী দর্শন হওয়ার দরুন দর্শনটি সৎ এবং অসৎ-এর ভেদ মানে। সৎ বস্তুর ব্যাখ্যা এখানে এভাবেই হয়—'অর্থক্রিয়াসমর্থং যৎ তদত্র পরমার্থসদ্' (যা অর্থবোধে সমর্থ, তাই পরমার্থ সদ্)

খাদ্যবস্তু যেমন— লুচি, মন্ডামিঠাই সত্য কেন না সেটি যুগপৎ অর্থ ও ক্রিয়ায় সমর্থ। অর্থক্রিয়া সমর্থকে সদ্ (বাস্তবিক) বলেই নয়—বরং পরমার্থ সদ্ বলা হয়েছে। যদি উপনিষদের তাত্ত্বিকদের নিরিখে দেখি তাহলে তাঁদের কথিত বস্তুগুলি যে অস্তিত্ববান—তার কী প্রমাণ রয়েছে? প্রয়োগের কষ্টিপাথরে সদ্‌বস্তুটি কতটা সঠিক, এটা দেখা উচিত। কেবল বুদ্ধির ভিত্তিতে কোনো বস্তুকে সদ্ বলা যেতে পারে না। যখন এটা নিয়ে আপত্তি ওঠে, তখন ধর্মকীর্তির ন্যায় দার্শনিক বলেন—'যদিদং স্বয়মর্থানাং রোচতে তত্র কে বয়ং'—অর্থাৎ যদি পদার্থগুলির এটাই পছন্দ—তাহলে আমরা সেখানে বাধা দেওয়ার কে? যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রগতি এই সূত্রের উপরই আধৃত। পদার্থচেতনাই সেক্ষেত্রে আমাদের পথ-প্রদর্শক।

## প্রজ্ঞাপারমিতা

'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ হল 'বোধি-যুক্ত'। বোধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা একই অর্থবাচক। ফারাক এটাই যে প্রজ্ঞা অসাধারণ জ্ঞানকে বলে থাকে। তবে বুদ্ধ শুধুমাত্র প্রজ্ঞাকেই মূল্য দেন না। তিনি শীল (সদাচার), সমাধি (মনের একাগ্রতা) এবং প্রজ্ঞা তিনটির ওপরেই সমান জোর দেন। তবুও এর মধ্যে প্রজ্ঞার স্থান প্রধান বলে একজন মহান দার্শনিক রূপে বুদ্ধ প্রতিভাত হয়েছেন।

বুদ্ধ তাঁর দার্শনিক বিচারধারাকে বোঝাতে গিয়ে সত্যের দুটি রূপকে তুলে ধরেছেন। একটি সত্য এমন, যার গভীরে গেলে সবটা সঠিক না হলেও ব্যবহারগত ক্ষেত্রে সেটাই পর্যাপ্ত। এটাকে ব্যবহার সত্য বা সংবৃতি সত্য বলা হয়ে থাকে। পাথর, লোহা, কাঠ যে রূপে আমরা দেখি এবং তার ব্যবহার করি—সেটাই সংবৃতি সত্য। কিন্তু পরমার্থগত সত্যের দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের মানতে হবে যে এগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণুর থেকে তৈরি। পরমাণুও স্থূল নয় সেগুলি বিদ্যুৎকণা এবং আরও সূক্ষ্ম দ্রব্যগত কণিকার সংযোগে তৈরি। বিদ্যুৎকণা কোনো এক স্থানে, একটি ক্ষণের জন্যেও স্থির থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা এটিকে কণা এবং তরঙ্গ দুই নামেই অভিহিত করে থাকেন। অন্যান্য কণাগুলির মধ্যে পজিট্রন, নিউট্রন এবং মেসোট্রন উল্লেখযোগ্য। এর থেকে বিশ্বের মূলগত ভিত্তির যে পরমাণুগুলির কথা আমরা জানি, সেগুলি যে কত অস্থির, প্রবাহের ন্যায় নিত্য বহমান তা আমরা জানতে পারি। এইভাবে আধুনিক বিচার-পদ্ধতিতে আমরা ব্যবহারগত সত্য এবং পরমার্থ সত্যের ভেদ নির্ণয় করি। বুদ্ধও এই ভেদগুলি বুঝিয়েছেন। আচার্য শান্তিদেব বলেছেন—

"সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতং।"

(অর্থাৎ সংবৃতি এবং পরমার্থ এই দুটি সত্য মানা হয়েছে।)

তাই প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বারাই বুদ্ধের দর্শন শূন্যবাদের ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। বলা হয়েছে—'যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতা সৈবতে মতাঃ' অর্থাৎ যা প্রতীত্যসমুৎপাদ—তাই শূন্যতা। এই শূন্যতাকেই জগতের যাবতীয় পদার্থের ভঙ্গুর স্বরূপ জেনে যোগীদের জন্যে ধ্যানের বিষয়বস্তু মানা হয়েছে।

যদিও শূন্যতা প্রাচীনতম বৌদ্ধ নিকায়গুলিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এর উপরে সর্বাধিক প্রভাব মহাযান দর্শনমতের—যার প্রবর্তক ছিলেন আচার্য নাগার্জুন। ইনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সাতবাহন রাজাদের তিনি বিশেষ সম্মানিত গুরু ছিলেন। তিনি বেশিরভাগ সময়ে শ্রীপর্বতেই থাকতেন তাই পরবর্তীকালে স্থানটির নাম নাগার্জুন কোন্ডা বা নাগার্জুন পর্বত হয়ে যায়। এই দর্শনপ্রণালীর মূল গ্রন্থ নাগার্জুন রচিত 'মাধ্যমিক-কারিকা'—যেটির সমর্থনে অনেকগুলি প্রজ্ঞাপারমিতার রচনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক দর্শন অনুসারে যাবতীয় তত্ত্ব, প্রাণী মায়ার ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায়, যাবতীয় ধর্ম ও পদার্থ মায়া এবং স্বপ্নের সমান। এই দর্শনপ্রণালীটি যথার্থধর্মী নয় তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল স্বপ্ন এবং বাস্তবে কোনো ফারাক নেই।

আমরা আহার করি। সেটা পেটে যায়। পরিপাক হতে থাকে। এর দ্বারা রক্ত এবং মাংসের বৃদ্ধি হয়। শরীরের অঙ্গে অঙ্গে সেটা গিয়ে পৌঁছয়। ক্ষণভঙ্গুরতার নিয়ম অনুসারে আমাদের শরীরের পরিবর্তন ক্ষণে-ক্ষণে সংঘটিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের ধারায় অন্ন বা খাদ্যবস্তুরও নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। সংবৃত্তি সত্য অনুসারে পালটাতে পালটাতে সেটি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। পরমার্থ সত্য অনুসারে শরীর, তার অবয়বগুলি, অন্যান্য কণাগুলি শেষে ওই বিদ্যুৎকণা এবং নিউট্রনরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। আহার্যবস্তু কোনোকালেই স্থির থাকে না। সেক্ষেত্রে কী জাগ্রত অবস্থায় চিবিয়ে খেয়ে আমি সব খাদ্য পদার্থগুলিকে স্বপ্নবৎ ভেবে বসব? ক্ষণভঙ্গুরতাও সত্য, আবার তার কার্যকারিতা বা ক্রিয়াশীলতাও সত্য।

বুদ্ধ যাবতীয় পদার্থকে ক্ষণভঙ্গুর নিরোধ ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। যাবতীয় পদার্থের জন্ম বা সৃজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু এবং ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী বলে বুদ্ধ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যখন এই উৎপত্তি এবং ধ্বংস, মায়া বা স্বপ্ন বলে মনে অনুভূত হবে, সেসময় কারই বা উৎপত্তি আবার কারই বা নিরোধ—এ কথাটাও মনে আসবে। তাই শূন্যবাদীরা বলে থাকে—

"অজাতমনিরুদ্ধং চ তস্মাৎসর্বমিদং জগৎ।"

(অর্থাৎ, এই সমস্ত জগৎটাই অজন্মা এবং অবিনাশী)

শূন্যবাদীদের ক্ষেত্রে বুদ্ধের দ্বারা কথিত চারটি আর্যসত্য মানার প্রয়োজন হয় না অন্তত পরমার্থ সত্যরূপে। তাই তারা সুখ-দুঃখকেও যেন কল্পিত বলেই মনে করে। সুখ-দুঃখ কেবল কল্পনা, এর কোনো অস্তিত্বই নেই এটা বলতে গিয়ে তাদের বক্তব্য—

"অহির্ময়ূরস্য সুখায় জায়তে
বিষং বিষাম্যাসবতো রসায়নং।
ভবন্তি চানন্দবিশেষহেতবো
মুখং তুদন্তঃ করভস্য কণ্টকাঃ।"

(সাপ ময়ূরের সুখের জন্যে জন্মায়, বিষ বিষের কার্যের জন্যেই রসায়ন হয়েছে। মুখে ফুটো করে দেওয়া কাঁটাগাছ উটের বিশেষ সুখের হয়।)

এরা বলতে চায়—যে সুখ বা দুঃখ, একই বস্তুর দুটি রূপ। তাই এদের কোনো আলাদা স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

প্রজ্ঞাপারমিতায় প্রজ্ঞা এবং শূন্যবাদের সংমিশ্রণে একটি মহাযান চেতনা প্রকাশ পেয়েছে যা এখনও সমধিক সমাদৃত। মূল সংস্কৃতে যদিও বা শতসাহস্রিকা, অষ্টসাহস্রিকা রূপে প্রজ্ঞাপারমিতার দু-তিনটি রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু তিব্বতিতে তিরিশটি এবং চিনা ভাষায় নয়'টি প্রজ্ঞাপারমিতার অনুবাদ পাওয়া যায়। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'য় প্রতিটি শ্লোকের বত্রিশটি অক্ষর সম্বলিত স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। এভাবেই আট হাজার বা অষ্ট সহস্র শ্লোকের সমন্বয়ে সংকলনটি লিখিত হয়েছে। তিব্বতি প্রজ্ঞাপারমিতা অনুযায়ী এর অনুবাদের 'কন্-জুর' সংগ্রহের মধ্যে একুশটি পুথি রয়েছে। বত্রিশ অক্ষর অনুযায়ী এদের শ্লোকের গণনা করলে দু-লাখ শ্লোক-সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। এদের নাম—১. শতসাহস্রিকা ২. পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা ৩. অষ্টাদশসাহস্রিকা ৪. দশসাহস্রিকা ৫. অষ্টসাহস্রিকা ৬. পঞ্চশতিকা ৭. শতপঞ্চাশতিকা, ৮. পঞ্চাশতিকা ৯. পঞ্চবিংশতিকা ১০. সপ্তশতিকা ১১. অষ্টশতিকা

১২. একাক্ষরী ইত্যাদি। এর কয়েকটির অনুবাদ চিনা ভাষায় পাওয়া যায়। সমস্ত প্রজ্ঞাপারমিতারই একটিই মূল বক্তব্য—'সমস্ত জগৎটাই মায়া এবং স্বপ্নবৎ'। প্রজ্ঞাপারমিতা নিয়ে বড়ো বড়ো গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে এবং শূন্যবাদ বোঝানোর জন্যে নাগার্জুন, আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি ইত্যাদি দার্শনিকেরা বড়ো বড়ো গ্রন্থ রচনা করেছেন। কবি এবং চিত্রকারদেরও প্রজ্ঞাপারমিতা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে প্রজ্ঞাপারমিতা এবং শূন্যতা একই। সিদ্ধ সরহপাদ করুণা এবং শূন্যতার উপর জোর দিয়েছেন। 'চর্যাগীতি'-তে তিনি বলেছেন—

"করুণ রহিঅ জো সুন্নহি লগ্গা। ণউ সো পাবই উত্তিম মগ্গা। অহবা করুণা কেবল সাহঅ। সো জম্মন্তরে মোক্ষ ণ পাবঅ।"

করুণা প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়া ও প্রেমকেই 'করুণা' নামে অভিহিত করা হয়। সরহের পরে অন্যান্য সিদ্ধরাও শূন্যতার উপর জোর দিয়েছেন। এই শূন্যতা এবং অনাত্মবাদ মূল বুদ্ধ ধর্মেও রয়েছে, যাকে প্রজ্ঞা বলা হয়েছে। সিদ্ধ কবিদের কাছেও প্রজ্ঞা একটি প্রিয় বিষয়।

ভাস্কররা প্রজ্ঞাপারমিতার অসাধারণ সব মূর্তি নির্মাণ করেছেন। জাভায় প্রাপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি তো বিশ্বের শিল্পদ্রব্যের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

## বৌদ্ধ ধর্মের অবদান

বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় যে অসাধারণ জীবনাদর্শ রেখে গেছেন—তা আপামর জনসাধারণের জন্যে কল্যাণপ্রদ হয়ে উঠেছে। তিনি যে আচরণগত, দর্শনগত বা তত্ত্বগত এবং স্থৈর্যগত শান্তি দেখিয়েছেন, তার দ্বারা জনমুক্তির ও শান্তির দুয়ার আগলমুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসে স্বাধীনতার পর যে 'পঞ্চশীল' শব্দটি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে এত প্রচলিত সেটিও বুদ্ধেরই কথিত। অবশ্য বুদ্ধ রাষ্ট্রের জন্যে নয়—ব্যক্তির জন্যে এটা অধিক ব্যবহার করেছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য কখনও রাজনৈতিক আগ্রাসনকে মূল্য দেওয়া হয়নি। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধরা নিজের বিচারকেই শ্রেষ্ঠ মানতেন, এবং সেটাকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না। যেখানে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে জোর করে তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা হামেশাই দেখা যায় এবং সত্তা, বিশেষ করে রাজসত্তা হাতে পেলে কীভাবে ছয় মাসের মধ্যেই ধর্মীয় বশ্যতা স্বীকার করানো যায়—তার বর্বর এবং স্বৈরতান্ত্রিক চেহারা আমরা দেখেছি এবং জানি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম সবসময় গণতান্ত্রিক উপায়ে বুঝিয়ে, যুক্তির দ্বারা আপন মতানুসারী করে তোলার পন্থাকেই একমাত্র উপায় হিসেবে মনে করেছে। বৌদ্ধরা নিজেদের গ্রন্থগুলিকে আরও সহজ এবং সুগম করে তোলার জন্যে গ্রন্থগুলি লৌকিক ভাষায় লেখা শুরু করল। তিব্বত এমন একটি দেশ ছিল, যেখানকার লোকদের না ছিল কোনো লিপি, না ছিল সাহিত্য। বৌদ্ধরা এ নিয়ে সামান্যও বিচলিত হয়নি যে এমন দুর্গম অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের কী ব্যবস্থা হবে? তিব্বতিরা এই সমস্যার সমাধান করার জন্য তাদের উচ্চারণের অনুরূপ ভারতীয় লিপিকে সামান্য পরিবর্তন করে তারা সেটিকে তিব্বতি লিপি বলে গ্রহণ করল। বৌদ্ধরা খুব ভালোভাবেই জানত যে কোনো জাতিই মূক হয় না। সংস্কৃতেও যে ধাতুগুলির থেকে শব্দ নির্মিত হয়—তার সংখ্যা দুই হাজারের বেশি নয়, কিন্তু এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই কাজে আসে, বাকীগুলি তুলনামূলক শব্দবিদ্যার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। তিব্বতি ব্যাকরণের অন্তর্গত ধাতুরূপগুলি এবং তার উপসর্গ ও প্রত্যয়গুলি ব্যবহার করে তারা ভাষার এতই সঠিক ও বহুল প্রয়োগ করতে শুরু করল যে ধর্মকীর্তি এবং শান্তরক্ষিতের ন্যায় দার্শনিকদের দর্শনমূলক গ্রন্থও তারা তিব্বতিতে লিখতে লাগল।

ধর্মের ব্যাপারে বুদ্ধ এবং তাঁর অনুচরদের লক্ষ্য মানসিক শক্তির বিকাশের দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর জন্যে তাঁরা গভীর অনুচিন্তন এবং যোগের সাহায্য নিয়েছিলেন। দেবতার ব্যাপারেও বৌদ্ধরা সমধিক উদার ছিলেন। মূর্তিপূজা ও প্রতীকের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে বুদ্ধমূর্তিকেও গ্রহণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ধার্মিক সহিষ্ণুতার দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্ম যেখানেই স্থাপিত হয়েছে—সেখানেই তাঁরা আঞ্চলিক ও লৌকিক দেবতাদের যথাযথ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্তরেও বুদ্ধ বিশেষভাবেই স্বীকৃত, বহুমানিত এবং সমাদৃত হয়েছেন। বুদ্ধ ধর্মের সামাজিক স্তরে স্বীকৃতি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুদের দ্বারা বুদ্ধকে দশাবতারের অন্যতম অবতার রূপে স্বীকৃতি এর জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সামাজিক ক্ষেত্রে বুদ্ধ বৈষম্যকে সরিয়ে সমতাকে স্থাপিত করার দিকে নজর দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র মুখের কথায় নয়, তিনি বর্ণ ব্যবস্থার বিশেষ বিরোধ করেছিলেন। নিপীড়িত, দলিত, অন্ত্যজ জাতির পুরুষ ও মহিলাদের তিনি সসম্মানে নিজের সংঘে আশ্রয় দিয়েছিলেন। প্রাচীন ব্যবস্থায় জাতি বা বর্ণকে উচ্চ মানা হত এবং সেই অনুযায়ী সমাজে বড়ো-ছোটো নির্ধারিত হত। কিন্তু বুদ্ধ নতুন ব্যবস্থা চালু করে সংঘে ভিক্ষুজীবনের সময়কালকে প্রধান নিয়ামক বলে গণ্য করেন। শাক্য বংশের একটি উপজাতির কুমার অনুরুদ্ধ বুদ্ধের কাছে ভিক্ষু হওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। সঙ্গে উপালি নামক এক নাপিতও ছিল। উপালির মনে হল—"যখন এরা সমস্ত ধন-সম্পদ বৈভব ত্যাগ করে ভিক্ষু হয়ে যাচ্ছে, তখন আমিও ভিক্ষুরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি না কেন?"—উপালির মনেও সন্ন্যাসের সংকল্প জেগেছে দেখে অনুরুদ্ধ বললেন—"যদি ভিক্ষু হতে চাও তাহলে আমার আগেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। তার কারণ, আমাদের মধ্যে জাতির অভিমান বড়ো প্রবল। বুদ্ধের সংঘে সেসব কিছুই নেই। সন্ন্যাস নেওয়ার পর যাতে আমার এই জাতির অভিমান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তার জন্যে তোমাকেই ভাই আগে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ভিক্ষুরূপে তুমি জ্যেষ্ঠ হলে সব সময়ে তোমায় অভিবাদন ও সম্মান করতে হবে—তা সে তুমি যে বংশ বা জাতিরই হও না কেন। এতে আমার ভিতরের জটিলতাগুলি নির্মূল হবে।"

উপালি তাই করেছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরূপে তিনি বিশেষ সম্মানিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের পর তাঁর উপদেশাবলী সংগ্রহের জন্য যে প্রথম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাতে উপালি একটি বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। কেন না ভিক্ষু-নিয়মাবলীর (বিনয়) বিষয়ে উপালির অতুলনীয় জ্ঞান ছিল। এ বিষয়ে তিনি সর্বমান্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এক্ষেত্রে, আমরা বুদ্ধের অতুলনীয় সামাজিক নিয়মের কথা জানতে পারি। বর্ণব্যবস্থার দিক থেকে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যসমাজকে কঠোর আঘাত করেছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের অবদান নগণ্য না হলেও তার বাস্তবিক প্রয়োগে এটি চূড়ান্ত অসফল হয়েছে। এর দায় বুদ্ধ এবং বৌদ্ধদের যতটা না ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল, তৎকালীন আর্থিক পরিস্থিতি। বুদ্ধ তাঁর সংঘে পূর্ণ সাম্যবাদ (**Communism**) আনতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আগের অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

## বৌদ্ধ দার্শনিকদের অবদান

বুদ্ধের সময়কালে এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণের পরে বহু দার্শনিক ছিলেন, যাঁরা বুদ্ধের বিচার ও দর্শনপ্রণালীকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। শূন্যতা, প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং মধ্যমা প্রতিপাদের ন্যায় মৌলিক দার্শনিক তত্ত্ব বুদ্ধের প্রধান দার্শনিক অবদান। বুদ্ধের নির্বাণের পর আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে প্রথম সতেরোশো বছর ভারতে বৌদ্ধ চিন্তাধারা প্রবল ছিল। এই সময়েই সারিপুত্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০), সাণবাসী (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০), মোগ্গলিপুত্ত তিস্সা (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী), নাগসেন (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী), অশ্বঘোষ (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী), মাতৃচেট (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী), নাগার্জুন (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী), অসঙ্গ (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী), বসুবন্ধু (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী), দিঙ্‌নাগ (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী), ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রিস্টাব্দ), প্রজ্ঞাকরগুপ্ত (সপ্তম শতাব্দী), শান্তরক্ষিত (অষ্টম শতাব্দী), কমলশীল (নবম শতাব্দী), জিতারি (দশম শতাব্দী), রত্নাকরশান্তি (একাদশ শতাব্দী), শাক্যশ্রীভদ্র (দ্বাদশ শতাব্দী) ইত্যাদি মহান দার্শনিকেরা হয়েছেন। ভারতের বাইরেও চিন, জাপান, সুবর্ণদ্বীপ, তিব্বত এবং মংগোলিয়াতেও বহু উচ্চ কোটি বৌদ্ধ দার্শনিকেরা জন্মেছেন।

শূন্যতা মানেই অনাত্মবাদ। বুদ্ধ যখন আত্মাকেই অস্বীকার করেছেন তখন তার সঙ্গে পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে যুক্ত করাটাই অবান্তর। ২ মে ১৯৫৬ তে রাজ্যসভায় ডঃ আম্বেদকর কিছু বলায়, পার্লামেন্টের জনৈক সদস্য বলে উঠে—"ভগবান, আপনার আত্মাকে রক্ষা করুন।" এর উত্তরে আম্বেদকর বলেন—"আমার কোনো আত্মা নেই। আমি একজন বৌদ্ধ। আমার আত্মার শান্তির জন্যে কারওর প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। আমি ঈশ্বর মানি না, আত্মাকে মানি না।"

আম্বেদকরের এই মন্তব্য তিন দিন পরের (৫ মে, ১৯৫৬) 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। সম্পাদক মহাশয় এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যে বলেন—"কিন্তু তিনি একটি অত্যন্ত বিবাদাস্পদ বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেছেন, যদি তিনি বলে থাকেন যে বৌদ্ধ দর্শন পূর্ণরূপে অনাত্মবাদী-নাস্তিক।"—এ মন্তব্য কতটাই না হাস্যকর। বৌদ্ধ দর্শন অনীশ্বরবাদী কিনা সেটা কী রাম, শ্যাম, যদু, মধু ঠিক করবে নাকি উপরোক্ত বৌদ্ধ দার্শনিকেরা? আসলে, লোকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে ভেঙে-চুরে নিজের মতো বানাতে চায়। প্রাচীন গ্রেসের লোকেরা দেবতাদের লালচুলের এবং গৌরবর্ণের বলে কল্পনা করত। বৈদিক আর্যরা দেবরাজ ইন্দ্রের রূপ স্বর্ণাভ গোঁফ-দাড়ি এবং স্বর্ণাভ কেশযুক্ত বলে মানতেন। এভাবেই এখনকার লোকেরাও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়ার দরুন, নিজের কল্পনার রঙে তাঁকে রাঙিয়ে তুলছেন।

অনাত্মবাদী হওয়ার জন্যে বৌদ্ধদের মধ্যে কখনও কোনোপ্রকার মতোবিরোধ হয়নি। বিচারগত প্রভেদের জন্য পরবর্তীকালে আঠারোটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যেমন হীনযান, মহাযান, বজ্রযানের ন্যায় ধারাগুলি উদ্ভূত হল। অবশ্য কয়েকটি সিদ্ধান্তগত চিন্তাধারা মৌলিক, যেগুলি পালি এবং অন্যান্য পিটকে একই রকম পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা আমাদের দেশে চিরন্তন উদারতার শিক্ষাই দিয়েছেন। সামাজিকতার দিক দিয়ে, আমরা বড়ো সংকীর্ণ ছিলাম। ম্লেচ্ছর স্পর্শ করা জল খেলে চিরদিনের মতো ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যেতে হত। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও নিজের জাতির বাইরে খাওয়াদাওয়ার কথা কেউ কল্পনাই করতে পারত না। আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে* একজন চৌধুরিও ছিলেন (ভূমিপতি)। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, তিনি বারাবঙ্কী জেলার জন্মভূমি ত্যাগ করে মুসৌরীতে চলে আসেন। সে বছর নন কমিশনড অফিসারদের প্রশিক্ষণ চলছিল। এদের মধ্যে চা-রুটি তৈরি করার জন্যে একজন মুসলমান বাবুর্চি ছিল। চৌধুরি মহাশয় দেখে হতবাক। বলে ফেললেন—"আমাদের গাঁয়ে এমনটা হলে তো ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেওয়া হত!" আমি হেসে বললাম—"চৌধুরিজি, সে সব ভূমিপতিদের দিন আর নেই। তোমাদের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত যাদবরা, যারা তোমারই স্বজাতি, তারাও এভাবেই সবার হাতের রুটি গ্রহণ করে। এতে তাদের জাতও যায় না, কেউ বেরও করে না তাদের জাত থেকে।"

সংকীর্ণতা এতটা হলেও, যেখানে বিচার ও তত্ত্বের ব্যাপার, সেখানে আমাদের সংস্কৃতি অনেকটাই উদার ছিল। ঈশ্বর মানুক বা না মানুক—প্রজ্ঞাবান মহৎ ব্যক্তিকে মহাত্মা বলা হত। 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ'। তাই কারও উপর জোর করে কিছু চাপানো হত না।

এই বিচারগত সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি একদিনে সম্ভব ছিল না। যাঁরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বৌদ্ধরাই সবচেয়ে অগ্রগামী।

কয়েকজন বৌদ্ধ দার্শনিকের কথা বলবার চেষ্টা করছি।

**নাগসেন**—ইনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রিক রাজা মিনান্ডারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল। সেই কথোপকথনই 'মিলিন্দ প্রশ্ন' রূপে—আমাদের সামনে এখনও রয়েছে। অনাত্মবাদের ব্যাপারে মনে প্রশ্ন ওঠায় মিনান্ডার জিজ্ঞাসা করেন—

"ভন্তে, যদি জীব কোনো বস্তুই নয়, তাহলে আমাদের মধ্যে এটা কী যা চোখের দ্বারা রূপদর্শন করে, কানের দ্বারা শব্দ শুনতে পায়, নাকের দ্বারা আঘ্রাণ করে, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদ পায়, শরীরের দ্বারা স্পর্শ করে এবং মনের দ্বারা ধর্মকে (বিষয়বস্তুকে) জানতে পারে?"

নাগসেন জবাব দিলেন—"মহারাজ, যদি শরীর থেকে ভিন্ন কোনো জীব থাকে এবং আমাদের ভিতরে বসে যদি সে চোখের দ্বারা রূপ দর্শন করে, তাহলে চোখ উৎপাটিত করে নিলে আমাদের আরও ভালো করে দেখা উচিত। কান কেটে নিলে বড়ো ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে আরও ভালো করে শোনা উচিত। এভাবেই নাক, জিভ ও শরীর কেটে ফেললে তাদের কার্যগুলি আরও ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত।"

মিনান্ডার বললেন—"না ভন্তে, এমনটা তো হয় না, বরং এর উলটোটাই হয়।"

নাগসেন স্মিতহাস্যে বললেন—"মহারাজ, তাহলে আমাদের ভেতর কোনো জীবই নেই।"

**মাতৃচেট**—মাতৃচেট খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর সময়, সম্রাট কনিষ্কের সমকালীন ছিলেন।

---

* গ্রন্থ রচনার সময় রাহুল মুসৌরীতে 'হর্ন ক্লিফ' নামক একটি সুদৃশ্য কাঠের বাড়িতে কমলা সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে বাস করতেন—অনুবাদক।

সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধ মহাপরিষদে যোগদান করার জন্য তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে পড়ার দরুন তিনি যোগদান করতে পারেননি। কনিষ্ককে লেখা মাতৃচেটের পত্রের তিব্বতি এবং চিনা অনুবাদ আজও পাওয়া যায়। মাতৃচেট 'সধ্যর্ধশতক' নামে দেড়শো শ্লোক সম্বলিত ভগবান বুদ্ধের একটি অপরূপ স্তোত্রগীতি রচনা করেছিলেন। এটি নালন্দায় প্রাথমিক কক্ষার বিদ্যার্থীদের পড়ানো হত।

**অসঙ্গ**—ইনি পেশোয়ারের পাঠান-ব্রাহ্মণদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি কত বড়ো দার্শনিক ছিলেন তার একটি প্রমাণই যথেষ্ট যখন বলা হয় যে ইনি যোগাচার বিজ্ঞানবাদের প্রবর্তক। এই বিজ্ঞানবাদকেই শঙ্করাচার্যের গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় স্বীকার করেছেন।

অসঙ্গ প্রণীত মহাগ্রন্থ 'যোগাচারভূমি' বিশেষভাবেই সমাদৃত ছিল কিন্তু এর সংস্কৃত মূল পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর 'যোগাচারভূমি'-র মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি উদ্ধার করা হয়। এটি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য অধুনা সম্পাদনা করে প্রকাশিত করেছেন।*

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা প্রাচীন কট্টরতার উপর ভয়ংকর প্রহার করেছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আজ এতকাল পরে আবার বুদ্ধ ফিরে এসেছেন। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশে অনীশ্বরবাদী, অনাত্মবাদী বুদ্ধের পুনরাগমনে নতুন আশা, নতুন আলোক উদ্ভাসিত হোক—এই প্রার্থনা করি।

---

* প্রসঙ্গত, রাহুল সাংকৃত্যায়নই সেই ব্যক্তি যিনি অসীম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে তিব্বত থেকে মূল 'যোগাচারভূমি' গ্রন্থটি উদ্ধার করে আনেন। ১৯৫৩ সালে গ্রন্থটির পাঁচটি অধ্যায় তিব্বতি ও চিনা অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করেন—অনুবাদক

## আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

সিংহ সেনাপতি ১০০.০০

জয় যৌধেয় ৮০.০০

বহুরঙ্গী মধুপুরী ৬০.০০

আমার লাদাখ যাত্রা ৫০.০০

কিন্নর দেশে ৭০.০০

ইরান ৫০.০০

ভবঘুরে শাস্ত্র ৫০.০০

তিব্বতে সওয়া বছর ৯০.০০

বিস্তৃত যাত্রী ৭০.০০

দর্শন-দিগ্‌দর্শন (১ম) ৭৫.০০

দর্শন-দিগ্‌দর্শন (২য়) ১২০.০০

বৌদ্ধ দর্শন ৬০.০০

মহামানব বুদ্ধ ৬০.০০

ইসলাম ধর্মের রূপরেখা ৫০.০০

রামরাজ্য ও মার্কসবাদ ৩০.০০

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ৬০.০০

চেতনার দাসত্ব ৪০.০০

আকবর ১৭৫.০০

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা ১৮০.০০

মাও-সে তুঙ ১৩০.০০

স্তালিন ৭০.০০